উ ৎ স র্গ

শ্রীপ্রদীপচন্দ্র বসু

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই

ভালোবাসা, প্রেম নয়
অসমতল
রহস্য কাহিনীর মতন
সুখনিবাস
প্রেমের গল্প
বাছাই গল্প

১

সকাল থেকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি নদীর ধারে।

আজ বাবা আসবে, সেইজন্য ভালো করে ঘুম হয়নি সারারাত। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে মনে হচ্ছিল, বাবা ঘোরা ফেরা করছে ঘরের মধ্যে। বাতাসে বাবার সিগারেটের গন্ধ।

বাবার স্টিমার এসে পৌঁছোনোর কথা ভোরবেলা। আমাদের এই ছোট্ট নদীটায় অবশ্য স্টিমার ঢোকে না। বাবাকে নামতে হবে ফতেপুরে। বাসুমামা আর নাদের আলি নৌকো নিয়েগেছে বাবাকে আনতে। দূরে একটা নৌকো দেখা গেলেই আমরা চোখ সরু করে তাকাচ্ছি, আমাদের নৌকো আর আসে না।

এই নদীর ঘাটে রবিবার হাট বসে। এখন চালাগুলো সব ফাঁকা পড়ে আছে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে কয়েকটা ভাঙা মাটির সরা আর কলসী। দু'একটা কুকুর শুয়ে আছে অলসভাবে। নদীর মাঝখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা। দৈবাৎ এখানে একটা-দুটো শুশুকও ভুস করে মাথা তুলে আবার ডুব মারে।

পাড়ের ওপর টেনে তোলা একটা নৌকোর গলুইতে বসে আছি আমি, শম্ভু আর রতন। নৌকোটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল, মাঝখানে তাপ্পি মেরে আবার সারা গায়ে আলকাৎরা মাখানো হয়েছে দু'দিন আগে। এখনও একটু একটু চটচট করে। প্যান্টে আলকাৎরা লাগলে মার খেতে হবে মায়ের কাছে।

বাবাকে দেড় বছর দেখিনি। যুদ্ধ চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে, বোমা

পড়েছে কলকাতায়। বাবাকে তাই কলকাতার অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মজফ্‌ফরপুরে। সে জায়গাটা কত দূরে কে জানে। বাবার চিঠি আসতেই সাত দিন লেগে যায়।

বাবা আসবে এই খবর শোনার পর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন খচখচ করছিল। বাবা আমাকে প্রথম দেখেই চিনতে পারবে তো? আমিও কি চিনতে পারবো বাবাকে। ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার পর মামাবাড়ির সবাই বলছে, আমার নাকি চেহারা অনেক বদলে গেছে। গলার আওয়াজ ভেঙেছে। বছর বছর মানুষের চেহারা বদলে যায়? তা হলে বাবার চেহারাও তো বদলে যেতে পারে! আমি মা কিংবা দিদির চেহারার বদল বুঝতে পারি না, মনে হয় একই রকম, কিন্তু বিদেশে থেকে বাবা যদি অন্যরকম হয়ে যায়!

দিদিও আসতে চেয়েছিল নদীর ঘাটে। কিন্তু বড় মামা ধমক দিয়ে বলেছেন, না যেতে হবে না। দিদি এখনও ঠিক বড়দের দলেও চলে যায় নি, আবার ছোটদের দলেও নেই। শিগগির দিদির বিয়ে হবে, তাই যখন তখন তার বাইরে যাওয়া নিষেধ।

বাবা এলেই তার গায়ে আমি বিদেশের গন্ধ পাই। বাবার চুলের ছাঁট অন্যরকম। বাবা ফুল হাতা শার্ট পরে, সেই জামার দুটো হাতায় থাকে কাফ্‌ লিংক, সেরকম জামা আমি এ গ্রামে আর কারুকে পরতে দেখিনি। প্যান্টের মধ্যে জামা গুঁজে কোমরে বেল্ট বাঁধে আমার বাবা। প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই দাড়ি কামায়। খুব গরমের সময়ে ধুতি আর গেঞ্জি পরতেও দেখেছি বাবাকে, কিন্তু দুটোই কি ধপধপে ফর্সা। এমন দুধের মতন সাদা গেঞ্জি এই গ্রামের একজনেরও নেই।

কলকাতা থেকে বাবা যখনই আসে, আমাদের জন্য জিনিস আনে অনেকরকম। কী সুন্দর চকলেট আর লজেঞ্চুস, খেলার বল, ব্যাড-

মিণ্টনের র‍্যাকেট, জামা, জুতো। এবার বাবাকে আমি চিঠি লিখেছি, আমার জন্য একটা মাউথ অর্গান।

বেলা বাড়ছে, রোদ চড়া হচ্ছে, আমাদের নৌকোর দেখা নেই। রায় বাড়ির একটা নৌকো এসে ঘাটে লাগলো। শম্ভু চেঁচিয়ে সেই নৌকোর মাঝিকে জিজ্ঞেস করলো, ও কুটিশ্বর, ফতেপুরে ইস্টিমার এসেছে কিনা জানো?

কুটিশ্বর বললো, না, দাঠাউর, আমি ওদিকে যাই নাই। ভোঁ শুনি নাই!

রতন বললো, আজ নিশ্চয়ই খুলনার ইস্টিমার অনেক লেট। আসবার হলে এতক্ষণ এসে যেত।

শম্ভু বললো, ক্ষুধা লাগছে, চল বাড়ি যাই!

আমি তবু তাকিয়ে রইলাম নদীর দিকে। রতন আর শম্ভু আমার মামাতো ভাই। ওদের তো আর বাবা আসছে না। আমার বাবা। যদিও আমার বাবা ওদের জন্যও কিছু না কিছু জিনিস আনে। রতন আর শম্ভু লাফিয়ে নেমে পড়লো নৌকোর গলুই থেকে। শম্ভু আবার হাত ধরে বললো, চল রে, মনি, আর শুধু শুধু বইয়া থাইক্কা কী করবি? এবেলা আর আসবে না!

আমারও যদিও খিদে পেয়েছে বেশ, তবু আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এই সময় ঠাইরেন দিদি আমাদের দুধ-মুড়ি আর শবরি কলা দেয়, সঙ্গে এক টুকরো গুড়। গুড়টা দুধ-মুড়ির সঙ্গে না মেখে পরে চেটে চেটে খাই।

শম্ভু আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

কুটিশ্বর বললো, ও দা ঠাউর, ঐ তো তোমাগো নৌকা আছে!

আমরা তিনজনেই উৎসুকভাবে তাকালাম। সত্যিই তো একটা কচুরিপানার বড়ো দামের পেছনে পেছনেই আসছে আমাদের নৌকো। বেশ কাছে এসে গেছে, তবু আমরা লক্ষ্য করিনি!

আমাদের এ নৌকোটা দেখলেই চেনা যায়, ছইটা সাদা রং করা। বড়ো মামার নিজস্ব শখের নৌকো।

আমরা তিনজন হুড়মুড়িয়ে নদীর ঘাটলার শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালাম।

ঘাটলাটা ভেঙে গেছে। এখন জল কম, তাই খানিকটা কাদায় পা না দিয়ে ওপরে ওঠা যায় না।

নৌকোটাকে আমাদের দিকে মুখ ঘোরাতে দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠলো। ছইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাসুমামা, নাদের আলি বৈঠা চালাচ্ছে, আর তো কারুকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কি বাবা আসেনি ?

ঘাটলার কাছে এসে কাদায় লগি পুঁতে নাদের আলি দড়ি দিয়ে বাঁধলো। তারপর নিচে নেমে সে নৌকোটা টেনে আরও খানিক ওপরে তোলার চেষ্টা করলো। বাসুমামা জোরে এক লাফ মেরে চলে এলো এদিকে।

এবার ছইয়ের ভেতর থেকে বেরুলো বাবা। কই চেহারা তো বদলায়নি। একই রকম, শুধু একটু যেন রোগা লাগছে। নীল প্যাণ্টের সঙ্গে সাদা শার্ট পরা। নাকের নিচে সরু গোঁফ, মাথায় বড়ো বড়ো চুল।

আশ্চর্য ব্যাপার, ছই থেকে বেরিয়েও বাবা একবারও তাকালো না আমাদের দিকে। মুখখানা কেমন যেন ঘুচিমুচি হয়ে আছে, খুব ব্যস্ত ও চিন্তিত মানুষের মতন।

পায়ের জুতো জোড়া প্রথমে ওপরে ছুঁড়ে দিলো বাবা। তারপর নেমে পড়লো কাদার মধ্যে।

এ কি, বাসুমামা এক লাফে পার হতে পারলো, আর আমার বাবা পারে না ? বাসুমামার থেকে কি বাবার গায়ের জোর কম ?

কাদার মধ্যে নেমে বাবা আবার নৌকোর দিকে ফিরে কাকে যেন

বললো, নেমে এসো। আমি ধরছি!

এবার ছই থেকে বেরিয়ে এলো একজন অচেনা মানুষ। বেশ লম্বা আর ফর্সা, মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস। মুখে চাপ দাড়ি। চোখে রোদ-চশমা। পাজামার ওপর পাঞ্জাবি পরা।

লোকটি চারদিকে একবার তাকালো। তারপর বাবার হাত ধরে কাদায় নামতে যেতেই নাদের আলি বললো, আমার কাঁধটা ধরেন, কত্তা!

বাবা আর নাদের আলি দু'জনে ধরাধরি করে লোকটিকে এমনভাবে নিয়ে এলো যাতে ওর পায়ে কাদা না লাগে। এতো খাতির করা হচ্ছে। এই লোকটা কে? একবার আমার সন্দেহ হলো, এর সঙ্গেই আমার দিদির বিয়ে হবে নাকি? কিন্তু বিয়ের বর তো অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে মাথায় টোপর পরে আসে। বিয়ের দিন ঠিক না হতেই আগে আগে একা কখনো বর তো আসে না।

ওপরে উঠে এসেও বাবা আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বললো না। ঐ লোকটিকে নিয়েই ব্যস্ত। আমরা তিনজন যে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তা গ্রাহ্যই করলো না বাবা।

বাসুমামা বললো, মালপত্তরগুলো তো নাদের একা আনতে পারবে না। এই কুটিশ্বর, তুই একটা বাক্স ধর তো!

কুটিশ্বর বললো, আপনেরা যান। আমি আর নাদের সব ব্যবস্থা করতেছি।

বাবা সেই লোকটিকে বললো, তুমি আমার কাঁধ ধরে চলো। রাস্তা ভালো না।

লোকটি বললো, না, না, আমি একাই যেতে পারবো।

আমার যদিও অভিমান হয়েছে, তবু আমি মৃদু গলায় ডাকলাম, বাবা।

বাবা এবার মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখলো। হাসি ফুটলো মুখে।

আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বললো, কেমন আছিস, মনি! তারপর শম্ভু আর রতনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোরা কেমন আছিস রে সবাই? বাঃ, রতনের গোঁফ গজাতে শুরু করেছে দেখছি!

কুটিশ্বর আর নাদের সুটকেশ আর বেডিং নামাচ্ছে, আমরা সেই-দিকে দেখতে লাগলাম। ওগুলোর মধ্যেই আছে আমাদের উপহারের জিনিসপত্র। কার ভাগ্যে এবার কী এসেছে কে জানে!

বাবা আর সেই লোকটি পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। এবার লক্ষ্য করলাম, লোকটি খোঁড়া। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মাটিতে ছোঁয়াচ্ছেই না একেবারে। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, বাবা নিশ্চয়ই দিদির জন্য খোঁড়া বর জোগাড় করে আনেনি। খোঁড়া না হলে অবশ্য দিদির সঙ্গে ওকে ভালোই মানাতো।

নদীর ঘাট থেকে আমার মামার বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। রায় বাড়ি আর নমশূদ্র পাড়া দিয়ে গেলে সাত-আট মিনিট লাগে। আর ওপাশের পাট খেতের ধার দিয়ে গেলে একটু ঘোরা পথ হয়। বাসুমামা পাটখেতের রাস্তাটাই ধরলো।

এক সময় আমরা এসে পৌঁছোলাম বাড়ির পেছন দিকে। উঠো-নের এক দিকে দুটো রান্না ঘর। আর এক দিকে থাকেন বড়ো পিসিমা। পাকা বাড়ির বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন আমার মায়ের বাবা তাঁর পাশে রয়েছে গড়গড়া। এক হাতে গড়-গড়ার নল মুখে দিয়ে অন্য হাতে তিনি হিসেবের খাতা পরীক্ষা করছেন।

আমার এই দাদামশাইটি জাঁদরেল মানুষ, গলার আওয়াজ রেগে গেলে ঠিক বাঘের মতন শোনায়। উনি অবশ্য আমাদের মতন ছোটদের কখনো ধমক দেন না, তবু ওঁকে আমরা সাঙ্ঘাতিক ভয় পাই।

অন্যবার বাবা প্রথমেই এসে দাদুকে প্রণাম করে। এবার বাবা তার বন্ধুকে নিয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ালো। তারপর আমাকে বললে, এক ঘটি জল নিয়ে আয় তো, মনি। পা ধোব।

আমি দৌড়ে জল নিয়ে এলাম। বাবা প্রথমে তার বন্ধুকে ঘটিটা দিয়ে বললো, ভালো করে পা ধুয়ে নাও, অমল।

সেই লোকটি পাজামা তুলতেই দেখা গেল তার বাঁ পায়ে অনেকখানি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। দাদু এক দৃষ্টে দেখছেন এই দু'জনকে।

এবার বাবা এসে দাদুকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো, আপনার শরীর ভালো আছে তো? গত মাসে খুব ঝড় হয়েছিল এদিকে, এ বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

দাদু বললেন, না। তোমাদের ইস্টিমার লেট করেছে নাকি? দেরি হলো?

বাবা বললো, হ্যাঁ, খুলনা থেকে ছাড়তেই দেরি হয়েছে। পুলিশ হঠাৎ সার্চ করলো। আজকাল হয়েছে এই এক উপদ্রব।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গের ঐ মানুষটি কে?

বাবা বললো, ও আমার এক বন্ধু, অমল রায়। কলকাতার সিটি কলেজে পড়ায়। এখন তো সব স্কুল-কলেজ বন্ধ, তাই আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।

দাদু যেন একটু বিরক্তভাবে বললেন, ওঁকে পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে এলে কেন? একজন ভদ্দরলোক প্রথমবার বাড়িতে এলো ...ওরে বাসু, বৈঠকখানাটা খুলে দে!

বাবা পেছন ফিরে বললো, এসো অমল, কাছে এসো। ইনি আমার শ্বশুর মশাই।

অমল রায় বারান্দায় উঠে প্রণাম করলো দাদুকে। দাদু আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করে বললেন, এসো, বাবা! তুমি সন্তোষের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছো, খুব খুশী হয়েছি। তোমরা কলকাতার

মানুষ, দেখে যাও, গ্রামে আমরা খারাপ থাকি না। এখানে টাটকা দুধ-মাছ পাবে। সে সব কি আর তোমাদের শহরে মেলে।

অমল রায় সামান্য হেসে মাথা নীচু করে রইলো। লোকটিকে দেখেই মনে হয়, খুব কম কথা বলে। আমাদের চেনাশুনো কোনো মানুষের মতন নয়।

দাদু তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন।

নাদের আর কুটিশ্বর স্যুটকেশ আর ব্যাগগুলো বয়ে এনেছে, বাসু-মামার নির্দেশে সেগুলো রাখা হলো আমাদের ঘরে। আমরা সবাই সেই ঘরে ভিড় করে রইলাম। কখন ওগুলো খোলা হবে ?

মা সেগুলো খাটের এক পাশে সরিয়ে রেখে বললো, দাঁড়া, আগে তোর বাবা আসুক। হ্যাঁরে, সঙ্গে কে এসেছে রে ?

আমরা অনেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললাম, অমল রায় ! অমল রায় !

সে আবার কে ?

মা ভুরু কুঁচকে রইলো। মা অমল রায়কে চেনে না।

দুটো স্যুটকেস, একটা বেডিং, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর দুটো বোঁচকা। স্যুটকেস দুটোই বাবার, আমরা চিনি। বেডিং-এর সত-রঞ্চিটাও আমাদের চেনা।

দিদি বললো, বাবার বন্ধু স্যুটকেসও আনেনি, বেডিংও আনে নি ?

সত্যি তো, একজন লোক রেল আর স্টিমারে চেপে এতদূর বেড়াতে এসেছে, অথচ বেডিং বা স্যুটকেস আনেনি ? এরকম তো কখনো দেখিনি !

দিদি বললো, মা, এই বোঁচকাটা আমাদের। এটা খুলি ?

দিদি আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। বোঁচকার গিঁট খুলতে আরম্ভ করে দিলো। আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দিদির ঘাড়ের ওপর।

প্রথমে বেরুলো কিছু পুরনো জামা কাপড়। তারপর দেখা গেল সেই বোঁচকার মধ্যে রয়েছে শুধু চাল! আমরা প্রায় হতবাক। কলকাতা শহর থেকে কেউ গ্রামে চাল নিয়ে আসে নাকি!

মা সেই চাল এক মুঠো তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বললো, মজফ্‌ফরপুরে খুব ভালো চাল পাওয়া যায়। ভালো করেছে এনেছে। এদিকে এখন চাল পাওয়া যায় না শুনেছে। আমার বাবা খুশী হবে!

তখন আমার মনে পড়লো, এখন সত্যিই এখানে চাল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। হাটে চাল বিক্রি হয় না। তার বদলে পাওয়া যায় প্রচুর আলু। গভর্নমেণ্ট নাকি মিলিটারিদের খাওয়াবার জন্য সব চাল নিয়ে নিয়েছে। মামাবাড়ির গোলায় যা চাল আছে, তা খরচ করা হচ্ছে একটু একটু করে। আমরা রোজ এখন ফেনা ভাত খাই।

এই সময় ঘরে এসে ঢুকলো বাবা।

দিদিকে বোঁচকাটার কাছে বসে থাকতে দেখে বাবা রীতিমত ধমক দিয়ে বললো, তোদের কি আর ত্বর সইলো না! এত হ্যাংলা হয়েছিস কেন, রাণী! ওঠ ওঠ, এবার কিচ্ছু আনিনি তোদের জন্য!

আমার চেয়েও দিদিকে বেশি ভালোবাসে বাবা। প্রথম দিন এসেই বাবা দিদিকে এমন বকুনি দেবে, এ যেন কল্পনাই করা যায় না। বাবা তা হলে সত্যি বদলে গেছে?

মা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো, তোমার সঙ্গে একজন বন্ধু এসেছে শুনলাম। অমল রায় কে? তোমার এই বন্ধুর নাম শুনিনি তো কক্ষনো?

বাবা মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো। তারপর বললো, এই বাচ্চারা তোরা এখন একটু যা তো ঘর থেকে। আবার একটু পরে আসবি। যা, যা—।

২

বড়োরা মনে করে, ছোটদের কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন রাখা যায়। ছোটদেরও যে অনেক নিজস্ব উপায় আছে, তা ওরা বোঝে না।

সন্ধ্যের মধ্যেই আমার জানা হয়ে গেল যে অমল রায় নামে কেউ নেই, ঐ লোকটির আসল নাম জীবনলাল মিশ্র। এই জীবনলাল একজন বিপ্লবী। পুলিশ তাকে সাঙ্ঘাতিকভাবে খুঁজছে, জীবন-লালের মাথার দাম দশ হাজার টাকা। কলকাতায় এলিট সিনেমা হলের পাশের গলিতে একটা বাড়িতে জীবনলাল লুকিয়ে ছিল, পুলিশ ঘিরে ফেললো সারা বাড়ি। জীবনলাল ছাদে উঠে বৃষ্টি জলের পাইপ বেয়ে নামবার সময় একজন পুলিশ তাকে গুলি করে, সে গুলি খেয়েছিল বাঁ পায়ে, তবু জীবনলাল অদৃশ্য হয়ে যায় সেই অবস্থায়। তারপর স্টিমারে বাবার সঙ্গে দেখা।

এইসব কথার অনেকটাই জানা যায় বাসুমামার কাছ থেকে। ফতেপুরে স্টিমার থেকে নেমে বাবা বাসুমামাকে বলতে বাধ্য হয়েছিল। এ বাড়িটা তো বাবার নিজের বাড়ি নয়, শ্বশুরবাড়ি।

বাসুমামা আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো। বাসুমামা আই এ ফেল করে আর পড়ে নি। কিছুদিন ঢাকায় আমার মেজমামার বাড়িতে থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেছিল, কিছু সুবিধে করতে না পেরে গ্রামে ফিরে এসেছে। আমার অন্য দু'মামা জমিজমার কাজ দেখে, কিন্তু বাসুমামা গ্রামের ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার

করে, এই তো পরপর দু'বছর করলো 'মেবার মতন' আর 'সিরাজ-উদ্দৌল্লা'। বাসুমামা ভালো মূর্তি গড়তেও পারে। চশমা-পরা সুভাষ বসুর একটা মূর্তি বানিয়েছে খুব সুন্দর।

বাসুমামা থাকে ছাদের ঘরে। সেখানে আমাদের মতন ছোটদের সবাইকে ডেকে বাসুমামা নানারকম গল্প শোনায়। বাসুমামার কাছ থেকেই আমরা শুনেছি ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন আর ভগৎ সিং-এর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

বাসুমামা আমাকে বললো, জামাইবাবুর কাছে যেই শুনলাম লোক-টির নাম জীবনলাল মিশ্র, অমনি আমি সব বুঝে গেলাম। কাগজে তো অনেকবার এর কথা পড়েছি। এই জীবনলাল মিশ্র পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনবার পালিয়েছে, ও একবার আলিপুর কোর্ট থেকে একজন বন্দীকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করেছিল।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওর কাছে বন্দুক আছে?

বাসুমামা বললো, থাকতেও পারে। ওদের কাছে সাধারণত রিভল-বার থাকে। রডা কম্পানির অনেকগুলো পিস্তল একবার লুট হয়েছিল, সেইগুলোই এখন বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘোরে।

বড় পিসিমার ঘরখানার পাশে একটা ছোট ঘর ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে, একখানা খাট পেতে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে জীবনলাল মিশ্রকে। সারাদিন সে ঘর থেকে জীবনলাল একবারও বেরোয় নি। ঐ ঘরেই তাকে খাবার দিয়ে আসা হয়েছে। দরজা বন্ধ, সে ঘরের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করলেই রহস্যময় মানুষটির কথা ভেবে আমার বুক ধক ধক করে।

বাসুমামা চেয়েছিল দাদুর কাছে জীবনলাল মিশ্রের পরিচয় গোপন রাখবে। বাবাও, সেই জন্য ওর অন্য নাম বানিয়েছিল। কিন্তু মা

প্রবল আপত্তি জানিয়েছে। তার বাপের বাড়িতে একজন বে-আইনি লোককে লুকিয়ে রাখা হবে, অথচ তার বাবা জানবে না, এ হতেই পারে না। বাবার অনুমতি নিতেই হবে।

দাদুকে বাবাও ভয় পায় একটু একটু। উনি কী বললেন, তার কিছু ঠিক নেই। উনি আশ্রয় দিতে রাজি না হলে জীবনলাল মিশ্রকে আজই তাড়িয়ে দিতে হবে।

তবু মায়ের তাড়নায় বাবা সন্ধেবেলা বাসুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদুকে সব কথা খুলে বললো।

দাদু চুপ করে সব শুনলেন। প্রথমেই রাগে ফেটে পড়লেন না। শান্তভাবে বললেন, সন্তোষ, তুমি জেনেশুনে একজন দাগী আসামীকে বাড়িতে নিয়ে এলে? এখন যদি পুলিশ টের পায়, তা হলে আমাদের সকলেরই যে হাতে দড়ি পড়বে? ও কি তোমার এতখানি বন্ধু?

বাবা বললো, না, তেমন বন্ধু নয় ঠিকই। কলকাতায় যখন আমি এক মেস বাড়িতে ছিলাম, তখন আমাদের রুম মেট ছিল জয়ন্ত। এই ছেলেটি তার ভাই। আমাদের মেসে এসেছে, সেই থেকে মুখ চেনা। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই, হঠাৎ খুলনা থেকে আসার সময় স্টিমারে দেখা।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশ স্টিমার সার্চ করতে এসে ওকে ধরতে পারে নি?

বাবা বললো, ও খালাসীদের মধ্যে লুকিয়েছিল। তাছাড়া পুলিশ ঠিক ওর খোঁজেই আসেইনি, জাপানী স্পাই খুঁজতে এসেছিল নাকি!

দাদু একটু চুপ করে থাকতেই বাবা আবার বললো, আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললো জীবনলাল। ওর পায়ে বুলেট লেগেছিল, সেটা নিজেই নাকি খাবলে বার করে দিয়েছে। এখন

এই অবস্থায় দৌড়োদৌড়ি-লাফালাফি করলে ওর পা-টা একেবারে যাবে। কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। তাই আমাকে অনুরোধ করলো, যদি কয়েকটা দিন আশ্রয় দিতে পারি।

দাদু বললেন, ওকে আশ্রয় দিলে যে আমরা বিপদে পড়বো, সেটা খেয়াল করো নি?

বাসুমামা এবার বললো, বাবা, আমরা তো দেশের জন্য কিছুই করি না। এইসব বিপ্লবীরা নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তাদের কি আমরা এইটুকু সাহায্যও করতে পারি না?

দাদু বললেন, প্রবল শক্তিমান ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এইসব ছেলেরা কয়েকটা সামান্য বন্দুক পিস্তল নিয়ে লড়তে চায়? এসব পাগলামি ছাড়া আর কি? এই জন্যই তো গান্ধীজী অহিংসার পথ নিতে বলেছেন।

বাসুমামা উত্তেজিত ভাবে বললো, ইংরেজরা এক গালে থাপ্পড় মারলে আমরা অন্য গাল বাড়িয়ে দেবো? তাহলে কোনোদিনও স্বাধীনতা আসবে না। জাপানিরা এখন ইংরেজদের প্রচণ্ড মার দিচ্ছে, এই সময় যদি দেশের ভেতর থেকে ইংরেজদের আমরাও ঠ্যালা দিই, তাহলে ওরা বাপ বাপ বলে পালাতে বাধ্য হবে।

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে দাদু বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুধা তোমাকে কিছু বলেনি?

বাবা বললো, সুধার সঙ্গে এখনো ভালো করে কথা হয়নি। কী বলুন তো?

দাদা বললেন, রাণীর বিয়ের একটা সম্বন্ধ করেছি এখানকার এস ডি ও'র ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি এবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছে, খুব ভালো পাত্র। এস ডি ও সাহেব বলেছেন, ওদের দাবি-দাওয়া বেশি নেই। এরকম পাত্র হাত ছাড়া করতে চাও।

বাবার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

দাহু বললেন, পরশুদিন এস ডি ও সাহেব সপরিবারে আসবেন পাত্রী দেখতে। তুমি আজ আসছো জেনেই আমি এইরকম দিন ঠিক করেছি।

বাসুমামা বললো, পরশুদিন আমরা জীবনবাবুকে বাঁশবাগানে লুকিয়ে রাখবো। কেউ টের পাবে না।

দাহু বললেন, আজকাল এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে সব সময় পুলিশ থাকে। উনি যেখানে যেখানে যান, আগে থেকে আই বি'র লোকেরা সেই জায়গা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়। তারা কিছু টের পাবে না ভেবেছো?

বাসুমামা তবু বললো, বাবা, আমরা এমনভাবে ওঁকে লুকিয়ে রাখবো…

দাহু ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর!

তারপর জামাইকে বললেন, তুমি বিদেশে থাকো। তোমার মেয়ে বড় হয়েছে, তার বিয়ের জন্য তোমার মাথা ব্যথা নেই। আমি ভালো পাত্র জোগাড় করলেও তোমরা ভণ্ডুল করতে চাও? হুট করে এক ফেরার আসামীকে বাড়িতে নিয়ে এলে, তোমাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

খানিকবাদে বাবা আর বাসুমামা দাহুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মাথা নীচু করে।

তখন সবে সন্ধে হয়েছে। দিদি, মিনু মাসি আর ওদের বন্ধু তসলিমা এক্কা দোক্কা খেলছে উঠোনে। বড় পিসিমা বারবার তাড়া দিচ্ছে ওদের, এই ছেমরীরা, এবার খেলা বন্ধ কর! এই মিনু, তুলসীতলায় পিদিম দিবি না? ও তসলিমা, এবার তুই বাড়ি যা, তোর মায় চিন্তা করবে।

এই সময় বন্ধ দরজা খুলে বাইরের মাটির বারান্দায় এসে দাঁড়ালো

জীবনলাল। এখন চোখে কালো চশমা নেই। পা-জামা পরা, খালি গা। মাথায় চুল উস্কো-খুস্কো। সমস্ত মুখখানা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে যেন।

দূর থেকে জীবনলালের সেই চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। দিদিরাও হঠাৎ খেলা থামিয়ে দিয়ে আড়ষ্ট ভাবে তার দিকে চেয়ে রইলো।

একটুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জীবনলাল অদ্ভুত, বিকৃত গলায় প্রায় আর্তনাদের মতন ডেকে উঠলো, সন্তোষদা! সন্তোষদা!

বাবা আর বাসুমামা কোথা থেকে যেন ছুটে এলো সেই মুহূর্তেই। বাবা খানিকটা ভয় পেয়ে বললেন, এ কী, তুমি বাইরে এসেছো কেন, চলো চলো ভেতরে চলো।

দুজনে প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই জীবনলালকে ঢুকিয়ে দিলো ঘরের মধ্যে।

একটু পরেই জানা গেল, জীবনলালের অসহ্য ব্যথা আর সাজ্ঘাতিক জ্বর হয়েছে। সে বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। বিছানার ওপর সে কাটা পাঁঠার মতন হুটফট করছে।

আমাদের গ্রামে কোনো ডাক্তার নেই। ছোটখাটো ব্যাপার হলে লোকে ফণী কম্পাউণ্ডার কিংবা নগেন কবিরাজকে ডাকে। আর শক্ত কোনো অসুখ হলে মাদারিপুর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে হয়।

রাত ন'টার সময় বাসুমামা ধরে নিয়ে এলো ফণী কম্পাউণ্ডারকে। তার চেহারা দেখলে সুস্থ লোকেও ভয় পায়। ঠিক যেন শ্মশানে আধপোড়া মড়া। কারখানার চিমনীর মতন লম্বা। চোখ দুটো সব সময় লাল।

ফণী কম্পাউণ্ডার রাত দশটা পর্যন্ত রইলো সেই ঘরে। দিদি এক-বার ওখানে গিয়ে এক বাটি গরম জল দিয়ে এলো, আমি জিজ্ঞেস

করলাম, কী দেখলি রে, দিদি ?

দিদি আমার কথার কোনো উত্তর দিলো না।

কেরোসিন তেল বেশি পাওয়া যাচ্ছে না বলে হ্যারিকেন নিভিয়ে দিতে হলো তাড়াতাড়ি। আমাকে শুয়ে পড়তে হলো রাত দশটার মধ্যে। ঘরে শুধু জ্বালা রইলো একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ। দিদি বড়ো হয়ে গেছে বলে এখন মিনু মাসির সঙ্গে আলাদা ঘরে শোয়। আমি আর মা এই ঘরে। আজ বাবা আমাদের সঙ্গে শোবে।

আমি একলা একলা শুয়ে আছি, মা রান্নাঘরে। আমার একটু একটু ঘুম আসছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে। এর মধ্যেই একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি। জীবনলাল যেন মরে গেছে। আমার দাদু পাঁঠা বলি দেওয়া খাঁড়াটা দিয়ে এককোপে তার মুণ্ডুটা কেটে একটা থালার ওপর বসিয়ে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, ঐ বিপ্লবীর মাথার দাম দশ হাজার টাকা। জীবনলাল মরে গেছে, তাহলে তার পিস্তলটা কী হবে ? সেটা আমি খুঁজছি, চতুর্দিকে খুঁজছি।

একসময় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, আবার জেগে উঠলাম বাবার গলা শুনে। চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ শুনে বোঝা যায়, মা চুল আঁচড়াচ্ছে।

বাবা জিজ্ঞেস করলো, মনি ঘুমিয়েছে ?

মা বললো, ও কোনোদিন এত রাতে জেগে থাকতে পারে না।

বাবা কাছে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। আমি প্রায় দম বন্ধ করে শুয়ে রইলাম মটকা মেরে। বাবা দু'বার ফিসফিস করে ডাকলো, মনি, মনি ! আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

মা জিজ্ঞেস করলো, এবার তুমি ছোটদের জন্য কিছুই আনো নি ?

বাবা বললো, কেন, খেলার বল এনেছি দুটো।

মা বললো, শুধু ঐ ? জামা-টামা কিছু আনো নি, মেয়েটার জন্য

শাড়ি আনোনি, মনি একটা মাউথ অর্গান চেয়েছিল।

বাবা হেসে বললো মজফ্ফরপুরে ওসব পাওয়া যায় নাকি?

মা বললো, কেন, তুমি বুঝি কলকাতা হয়ে আসো নি?

বাবা এবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, হ্যাঁ, কলকাতা হয়ে এসেছি ঠিকই। কিন্তু সুধা, আমার পয়সা ছিল না। এবার আমার হাত খালি।

মা তীক্ষ্ণভাবে বললো, হাত খালি মানে? তুমি এবার এতদিন পর এলে।

বাবা বললো, দিনকাল খুব খারাপ। আমার চাকরিটা গেছে। গত ছ'মাস আমার চাকরি নেই, তোমাদের জানাইনি।

মা আঁতকে উঠে বললো, কী সর্বনাশ! বলছো কী গো? তা হলে আমাদের কী হবে? তুমি আমাদের বছরের পর বছর বাপের বাড়িতে ফেলে রাখবে, আমার কি কোনো মান-সম্মান নেই?

বাবা দুর্বলভাবে বললো, কী করবো, সময়টা যে বড় খারাপ। যুদ্ধের জন্য অনেকগুলো কম্পানি বন্ধ হয়ে গেছে।

ফোঁপানির শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম মা কাঁদছে।

একবার পাশ ফিরে চোখ পিটপিট করে দেখি, বিছানার ওপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে মা, বাবা পাশে দাঁড়িয়ে মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলছে, সুধা, অবুঝ হয়ো না। আমি তো চেষ্টা করছি। দু'তিন মাসের মধ্যে ডিফেন্সের একটা চাকরি পাবার আশা আছে। তবে আসামে যেতে হবে।

একটু পরে কান্না থামিয়ে মা বললো, তোমার হাতে কিছু টাকা নেই? তা হলে রাণীর বিয়ে হবে কী করে? বাবা এদিকে সব ব্যবস্থা করছেন।

বাবা বললো, তোমার বাবার কাছ থেকে ধার করতে হবে।

মা বললো, ছিঃ! শ্বশুরের কাছ থেকে তুমি টাকা চাইবে তোমার

লজ্জা করে না? সবাই বলবে, নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যও তোমার নেই। তোমার লজ্জা না করুক, আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। বরং আমার সব গহনা তুমি বিক্রী করে দিয়ে এসো। বাবা যেন কিছু না জানতে পারে। এরকম ভালো পাত্র কি আর পাওয়া যাবে?

বাবা বললো, কথাবার্তা চলুক না। টাকা পয়সার কথা পরে চিন্তা করা যাবে। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

এই সময় ঘর ভরে গেল সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে। দাদু সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না বলে বাবাকে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেতে হয়। এই ধোঁয়ার গন্ধটা আমার ভালো লাগে। বাবা বলছে, তার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই, তাহলে বাবা কি একসময় সিগারেট ছেড়ে অন্যদের মতন বিড়ি খাবে নাকি? আমার বাবার হাতে সিগারেটের বদলে বিড়ি, এ দৃশ্য আমি ভাবতেই পারি না।

একটু বাদে মা আবার ফোঁস করে উঠে বললো, তোমার চাকরি-বাকরি নেই, হাতে টাকা-পয়সা নেই, তবু তুমি একটা অচেনা লোককে এ বাড়িতে নিয়ে এলে কী করে?

এই প্রশ্নটা আজ সারাদিনে অনেকবার শুনতে হয়েছে বাবাকে, তাই খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, একটা লোক বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়েছে, তাকে আমি না বলবো কী করে?

মা বললো, কত লোকেরই তো বিপদ হয়। তুমি সবাইকে সাহায্য করতে পারবে? তা ছাড়া এটা কি তোমার বাড়ি? চেনা নেই শোনা নেই, হুট করে একটা লোককে একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আনলে!

বাবা বললো, ও অচেনা নয়। আমার এক বন্ধুর ভাই। তা ছাড়া আমি ফতেপুরে নেমে বাসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাসু নিজেও

খুব উৎসাহ দেখিয়ে ওকে নিয়ে এসেছে।

মা বললো, ও কবে যাবে ? নারায়ণগঞ্জে তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

বাবা এবার নীচু গলায় বললো, ওর পায়ে গুলি লেগেছিল। হাঁটার ক্ষমতা নেই। এখন ওকে সরানো যাবে না।

মা বললো, পরশু পাত্রপক্ষ রাণীকে দেখতে আসবে। সেদিন একটা কেলেংকারি হবে।

বাবা বললো, এস ডি ও সাহেবকে খবর পাঠানো হচ্ছে, পরশুর বদলে সামনের রবিবার আসার জন্য। তার মধ্যে···ফণী কম্পাউণ্ডার কী বলে গেল জানো ? ওর পায়ে সেপটিক হয়ে গেছে, অপারেশন না করালে বাঁচবে না। বড়ো জোর দু'তিনদিন। এত জ্বর, গা একে-বারে পুড়ে যাচ্ছে।

মা এবার একটু ভয় পেয়ে বললো, ও বাঁচবে না ?

বাবা অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, এই গ্রামের মধ্যে কে ওর অপারেশন করবে ? ও শহরেও যেতে চায় না। আমরা আর কী করতে পারি ? ও যদি মরেই যায়, তাতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। নদীতে ভাসিয়ে দিলেই হবে।

আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। জীবনলাল মরে যাবে ? আমি ভেবে-ছিলাম, এ বাড়িতে পুলিশ আসবে, জীবনলাল তার পিস্তল দিয়ে লড়াই করবে পুলিশের সঙ্গে, তিন চারটে পুলিশকে মেরে, তার-পর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যাবে সূর্য সেনের মতন। তা নয়, বিছানায় শুয়ে, জ্বরে ভুগে ভুগে মৃত্যু কি কোনো বিপ্লবীকে মানায় ?

আমার বাবাকে আমি সমস্ত পুরুষ মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। বাবা একজন বিপ্লবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলে আমার গর্ব হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম বাবার প্রতি আমার ঘৃণা হলো।

বাবা চায় যে জীবনলাল মরে যাক ? ও মরে গেলে বাবা-মা খুশী হবে ?

সন্ধেবেলা জীবনলাল যখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল, সে যেন কোনো ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। ঠিক বীর পুরুষদের মতন চেহারা। সরু কোমর, চওড়া বুক, হাত দুটো দেখলেই বোঝা যায় তার গায়ে খুব জোর, তার মুখের দাড়িটাও সুন্দর মানিয়েছে। এই রকম মানুষেরা শুধু পায়ে একটা গুলি খেয়ে মরে যাবার জন্য কি পৃথিবীতে আসে ?

পরদিন খুব ভোরে বাবা-মা জাগবার আগেই আমি চলে এলাম বাইরে।

উঠোনের এক কোণে টগর ফুলের ঝাড়টার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দিদি আর তসলিমা। মিনু মাসি নেই। দিদি আর তসলিমা ঠিক এক বয়সী, ওরা সব সময় এক সঙ্গে থাকে। যদিও তসলিমাদের বাড়ি পুকুরের ওপারে।

তসলিমা পরে আছে একটা নীল শাড়ি, মাথার চুল আঁচড়ায় নি, চোখে যেন এখনো লেগে আছে ঘুম। দিদির হাতে একটা ফুলের সাজি, কিন্তু একটাও ফুল তোলে নি।

ওরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জীবনলালের ঘরটার দিকে। সেই ঘর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। জীবনলাল কাৎরাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে, মা, মা, মা !

আমার মনে হলো, জীবনলাল বোধহয় মরে যাচ্ছে। কোথায় থাকে ওর মা ? মাকে এতো ডাকছে, মৃত্যুর আগে কি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না ?

আমার দিকে চোখ পড়তেই দিদি ব্যাকুলভাবে বললো, এই [illegible] একবার ছাখ তো, ঘরের মধ্যে গিয়ে ছাখ তো !

আমি দৌড়ে উঠোন পার হয়ে বড়ো পিসিমার ঘরের দাওয়ায় উঠে

Central Library
R L F
No. 517
Agartala
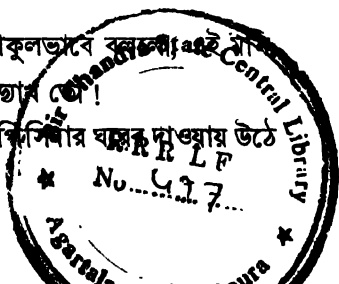
পাশের ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললাম। বিছানার ওপর ছট-ফট করছে জীবনলাল। এক একবার সে মাথাটা উঁচু করে ওঠবার চেষ্টা করেও পড়ে যাচ্ছে বিছনায়।

দিদি আর তসলিমাও এসে আমার পাশে দাঁড়ালো।

আমার মনে হলো, জীবনলাল যেন এক বন্দী রাজকুমার। তার শরীর বিছানার সঙ্গে বাঁধা। সে উঠবার চেষ্টা করেও পারছে না।

৩

আমাদের মামাবাড়ির পাশেই কালো বউয়ের দিঘি। এত বড়ো দিঘি কাছাকাছি বিশ-পঞ্চাশখানা গ্রামে নেই। কোনো এক সময়ে কোনো এক কালো বউ শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এখানে ডুবে মরেছিল, তাই এই দিঘির ঐ নাম।

সেই দিঘির ওপাশে একটা বাগান। সেখানে জারুল গাছই বেশি, আম-জাম-বাঁশঝাড়ও রয়েছে। সেই বাগান পার হয়ে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। ওঁদের মস্ত বড়ো পরিবার, সব সুদ্ধ পঁচিশ তিরিশজনের কম নয়, জমি-জায়গাও কম নয়।

এই আমিনুল সাহেব প্রায়ই সন্ধের সময় আমার দাদুর সঙ্গে দাবা খেলতে আসেন। দু'জনের চেহারা ও স্বভাবে কোনো মিল নেই, তবু দু'জনের খুব বন্ধুত্ব। আমার দাদামশাইয়ের গলার আওয়াজ গমগমে, আমিনুল সাহেব কথা বলেন মিষ্টি মৃদু গলায়। তাঁর চেহারাও ছোট্টখাট্টো। বয়েসেও তিনি দাদুর চেয়ে কিছুটা ছোট। হাঁটুতে বাতের অসুখ আছে বলে অতখানি দিঘির পাড় ঘুরে আসতে তাঁর কষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি দিঘিতে ছোট্ট একটা ডিঙ্গি নৌকো রেখেছেন। সেই নৌকোতে পার হয়ে আসেন।

বৈঠকখানা ঘরে দু'জনে দাবা খেলতে খেলতে কতো যে রাত করে ফেলেন, তা খেয়ালই রাখেন না। বড়ো পিসিমা মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে বলেন, ও চৌধুরী সাহেব। বাড়ি যাবেন না! আপনার বউ কতক্ষণ আপনার জন্য ভাত নিয়ে বসে থাকবে?

আমিনুল চৌধুরী হেসে বলেন, আমার বউ সন্ধ্যাকালেই এক ঘুম ঘুমিয়ে নেয়। জানে তো, আমি রাত্রি বারোটার আগে খাই না।

দাতু পিসিমাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোরা গোল করিস না তো। আমাদের এখনও কিস্তি মাৎ হয়নি, এর মধ্যে খাওয়ার কথা আসে কিসে ?

পরের দিন সন্ধেবেলা দাতু আর আমিনুল চৌধুরী দাবার ছক পেতে বসেছেন মুখোমুখি, দু'জনের হাতেই গড়গড়ার নল। কেরোসিন তেলের যতই টানাটানি থাকুক, দাবা খেলার জন্য হ্যারিকেন জ্বলবেই।

প্রথমেই ঘোড়ার চাল দিয়ে আমিনুল চৌধুরী বললেন, দাদা, জাপানীরা বার্মা পর্যন্ত এসে পড়েছে, শুনেছেন ?

দাতু বললেন, ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজরা এ যুদ্ধটা হেরেই যাবে শেষ পর্যন্ত।

চৌধুরী সাহেব বললেন, হারুক, হারুক। অনেকদিন তো ইংরেজের রাজত্ব দেখলাম, এবার কিছুদিন জাপানীদের রাজত্ব দেখি!

দাতু বললেন, তুমি কও কি, চৌধুরী ? সাহেবদের রাজত্ব গেলে আমরা জাপানীদের প্রজা হবো ? ইংরেজরা তবু কোর্ট কাচারি মানে, তুমি ইচ্ছে করলে একজন সাহেবের নামেও মামলা আনতে পারো। কিন্তু জাপানীরা কি সে সব মানবে ? ওরা হাতে মাথা কাটবে না ?

চৌধুরী সাহেব বললেন, জাপানীরা কি সরাসরি রাজত্ব করবে ? তারা সুভাষবাবুকে সিংহাসনে বসাবে। ঢাকায় জোর গুজব। সুভাষবাবু নাকি তরোয়াল হাতে নিয়ে বর্মায় সৈন্যদের চালাচ্ছেন।

দাতু বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, চৌধুরী ? সুভাষবাবু সিংহাসনে বসতে চাইলেও কি গান্ধী-জিন্না-জওহরলাল ছেড়ে

দেবে? ওরা কেউ সুভাষবাবুকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

চৌধুরী সাহেব বলেন, 'এই দিলাম, গজের চাল। আপনার মন্ত্রী সামলান। দাদা, আপনার বাড়িতে একজন টেররিস্টকে আশ্রয় দিয়েছেন?

দাদু চাল দিতে গিয়েও হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, অ্যাঁ? সে কথা তোমারও কানে গেছে?

—আমি আপনার প্রতিবেশী, আমি জানবো না?

—তবে যে আমার হারামজাদা ছেলেটা বললো, এখবর কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না?

—গ্রাম দেশে এসব খবর চাপা থাকে না। বাসু আমাদের ফণী কম্পাউণ্ডারকে কী বলে শাসিয়েছে জানেন? ফণীকে তো কাল চিকিৎসার জন্য ডেকে এনেছিল। তখন বাসু ফণীকে বলেছে, একথা যদি কারুরে বলিস, তাইলে রামদা দিয়ে তোর মুণ্ডু কেটে ফেলাবো।

—ফণী অমনি সেই কথা গিয়ে তোমাকে বলেছে?

—নাহ্, ফণীর সেই সাহস নেই। বাসু নিজেই বলেছে। বাসু ফণীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, আমার ছেলের মটোর সাইকেলটা ধার চাইতে। ওরা দুইজনে সেই সাইকেলে মাদারিপুর গেল।

—কেন, মাদারিপুর গেল কেন?

—লোকটা তো বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে বসেছিল। ওরা মাদারি-পুর থেকে ওষুধ, ইঞ্জেকশান, গজ ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলো। সেই ওষুধে অনেকটা সুস্থ হয়েছে শুনেছি।

—এ সব কথা আমাকে কিছুই বলে নি।

—আপনার ছেলেরা আপনাকে ভয় পায়। কিন্তু বাসু আমার কাছে গিয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে।

—পয়সা পেলো কোথায় ? তোমার কাছ থেকে নিয়েছে ?

—আরে, কী যে বলেন ! সে সব কিছু না। আর বাসু যদি তার চাচার কাছ থেকে কিছু নেয়ও, তাতে আপনার কী ?

—চৌধুরী, বড়ো বিপদে পড়ে গেছি। আমার জামাইটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। পুলিশের দাগী আসামীকে কেউ বাড়িতে আনে ? এদিকে আমার নাতনির সঙ্গে আমি এস ডি ও সাহেবের ছেলের সম্বন্ধ করে বসে আছি। এস ডি ও নিজে আসবেন পাত্রী দেখতে।

—দাদা, একটা কথা বলবো ? লোকটিকে কয়েকদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলে হয় না ?

—না, না, তা কী করে হয়, চৌধুরী ? আমার বিপদ তোমার ঘাড়ে চাপাবো কেন ? সে হয় না। অন্য কিছু বুদ্ধি দাও তো !

—আমার সংসারে অনেক মানুষ। তার মধ্যে আর একটা মানুষ মিশে থাকলে কেউ টের পাবে না। আমার খামার ঘরটা খালি পড়ে আছে, সেখানে কয়েকটা দিন ঐ মানুষটা থাকতে পারে।

—তোমার বাড়িতে পুলিশ গেলে ঠিক খুঁজে বার করবে।

—সে বিষয়েও কথা আছে। আপনার বাড়ির ওপর যতখানি পুলিশের সন্দেহ হবে, আমার বাড়ির ওপর তেমন হবে না। মুসলমানদের এখনো পুলিশ তেমন সন্দেহ করে না। হিন্দুর ছেলে মুসলমানের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারে, পুলিশ সে কথা ভাববে না।

—কিন্তু গ্রামের মধ্যে কথাটা যদি চাউর হয়ে যায় ?

—আমিনুল ইসলাম চৌধুরীকে বিপদে ফেলতে চায়, এমন মানুষ এ গ্রামে একজনও আছে ? কেউ যদি সেরকম বাঁদরামি করে, তা হলে তার ঘাড়ে মাথা থাকবে না। দাদা, আমি বলি কি, লোকটারে আমার বাড়িতেই নিই যাই।

—এসব কথা তোমাকে কে বোঝালো বলো তো, চৌধুরী ? ঐ বাসু

হারামজাদা নিশ্চয়ই। না, না, তোমাকে এই বিপদের ঝুঁকির মধ্যে আমি ফেলতে চাই না।

—বাসু কি বলেছে জানেন? আসল বিপদ আপনাকে নিয়ে। আপনি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! পুলিশ এসে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কত্তামশাই, আপনার বাড়িতে কি একজন বিপ্লবী লুকিয়ে আছে, আপনি তো মিথ্যে বলতে পারবেন না! আপনি সোজা আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবেন!

—তুমি বুঝি খুব মিথ্যে বলতে পারো?

—মিথ্যে না বললেও, সময়ে সময়ে সত্য গোপন করাও যথার্থ ধর্ম। যে মিথ্যা বললে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচে, সে মিথ্যা অনেক সত্যের চেয়েও বড়ো!

সেই রাত্তিরেই জীবনলালকে চাপিয়ে দেওয়া হলো চৌধুরী সাহেবের নৌকোয়। সে তখন আর কাৎরাচ্ছে না বটে, তবে ওষুধের ঘোরে নির্জীব হয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে নৌকোটা মিলিয়ে গেল।

দু'দিন বাদে বাসুমামা বাবাকে বললো, ঐ ফণী কম্পাউণ্ডারকে আমরা হেলাফেলা করতাম, কিন্তু লোকটার গুণ আছে স্বীকার করতেই হবে। একটা মুমূর্ষু রুগীকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে বলতে গেলে।

প্রথম প্রথম জীবনলাল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতো আর নিজের মাকে ডাকতো। এখন সে অনেকটা শান্ত হয়েছে, উঠে বসতেও পারে। নিজে নিজে খাবার খায়। জীবনলালের খোঁজ খবর নেবার জন্য চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে আমাদের যাওয়া নিষেধ, শুধু বাসু-মামা একা রাত্তিরবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে যায়। বাসুমামার মুখে আমরা তার অনেকটা ভালো হয়ে ওঠার খবর পাই।

রবিবার দিন এস ডি ও সাহেব এলেন সদলবলে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, আরও একজন মহিলা, দুজন আর্দালি আর একজন বন্দুকধারী

পুলিশ। আর্দালি আর পুলিশরা বসে রইলো পুকুর ঘাটে। এস ডি ও সাহেব বাঙালী হলেও মাথায় সাহেবদের মতন শোলার টুপি পরে থাকেন।

দিদি হঠাৎ এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

আমার দিদিকে সবাই লাজুক আর ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে বলেই জানে। কারুর মুখের ওপর কথা বলে না। আমার সঙ্গে দিদির কখনো ঝগড়া হলে আমিই শেষ পর্যন্ত জিতে যাই। দিদি হেরে গিয়ে কাঁদে। আমি অনেকবার দিদির চুল ধরে টেনেছি, দু'একবার ঠেলেও ফেলে দিয়েছি, কিন্তু দিদি কখনো আমার গায়ে হাত তোলে না।

সেই দিদি হঠাৎ বেঁকে বসলো। সে এস ডি ও সাহেবের সামনে কিছুতেই সাজগোজ করে যাবে না। সে এ বিয়েতে রাজি নয়।

মা, পিসিমারা কত করে বোঝালো। বাবা এসে দু'তিনবার ধমকে গেল। তবু জেদ ধরে রইলো দিদি। সে কিছুতেই যাবে না। এরই মধ্যে জোর করে চুল আঁচড়ে, গালে পাউডার মাখিয়ে দেওয়া হলো, পরানো হলো একটা জরির শাড়ি। তবু দিদি খাটের পায়া চেপে ধরে হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত এলেন দাদামশাই। তাঁর খড়মের ঠকঠকানি শুনলেই ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়ে যায়। আমি পেছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলাম।

দাদু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, কী হয়েছে, রাণী, দেরি করছিস কেন? ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা বসে আছেন, আয়, আমার সঙ্গে আয়।

দিদি বললো, না, আমি যাবো না!

দাদু এবার বাঘের মতন গরগর করতে করতে বললেন, যাবি না মানে? তোকে দেখতে ওঁরা এসেছেন, তুই যাবি না? শিগগির

আয় !
দিদি আবার বললো, আমি যাবো না।
মা বললো, রাণী, ন্যাকামি করিস না। বাবা ডাকছেন, ওঠ্ !
দিদি বললো, আমাকে তোমরা জোর করে পাঠাবে ? তা হলে আমি কালো বউ দিঘিতে ডুবে মরবো !
শেষ পর্যন্ত, দাদু পর্যন্ত হার মেনে গেলেন। রাগ করে ধমক দেবার বদলে তিনি নরমভাবে অনুরোধ করে বললেন, ঠিক আছে, ও বাড়িতে তোর বিয়ে দেবো না। তুই একবার শুধু আয়। ওনাদের ডেকে এনেছি, আমার একটা মান সম্মান আছে, একটুখানি ওদের সামনে গিয়ে বসবি। আয় দিদি লক্ষ্মীটি।
দিদি প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা নাড়ালো।
মা এবার আর রাগ সামলাতে না পেরে একটা চড় কষালো দিদির গালে।
দিদি উঠে দাঁড়িয়ে একটা দৌড় মারলো। আমরা ভাবলাম দিদি বুঝি সত্যি দিঘিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। আমরা কয়েকজন হৈ হৈ করে ছুটে গেলাম পেছন পেছন। দিদি অবশ্য জলে ঝাঁপ দিলো না, দিঘির দক্ষিণ পাড় দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল আমিন চৌধুরী সাহেবদের বাড়ির দিকে।
রাত্তিরে মা বাবাকে অনেক বকুনি দিতে বললো, আরও তুমি বাড়ির মধ্যে বাইরের একটা উটকো মানুষ এনে ঢোকাও! ঐ লোকটাই রাণীর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে !
মাথা ঘোরাবার ব্যাপারটা ঠিক না বুঝলেও ততদিনে আমি জেনে গেছি প্রেম নামে একটা ব্যাপার আছে। আমার চেয়ে আর একটু বেশি বয়েসের ছেলে-মেয়েরা বিয়ের আগে আড়ালে পরস্পরের দিকে চেয়ে একটু হাসে, কিংবা হাত ধরে, কিংবা চিঠি লেখে, এর নাম প্রেম। দু'একখানা বড়দের বই আমি পড়ে ফেলেছি, তাতে

এরকম থাকে। কিন্তু দিদি তো এ পর্যন্ত ঐ জীবনলালের সঙ্গে একটা কথাও বলে নি! সেই প্রথম দিন সকালে আমার সঙ্গে ওর ঘরে ঢুকে দিদি শুধু কপালে একবার হাত রেখেছিল। জীবনলাল জ্বরের ঘোরে চোখ মেলেও দেখেনি।

দিঘির ওপারে চৌধুরীদের বাড়ি যাওয়া দিদির নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দাদু সাংঘাতিক রেগে আছেন। তিনি বাড়ির কারুর সঙ্গেই কথা বলছেন না। এস ডি ও সাহেব তাকে অপমান করে চলে গেছেন।

দিদিকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। বাবা পর্যন্ত রাগ করে দিদিকে একবার বললো, ছি ছি, তোর জন্য আমাদের সকলের লজ্জায় মাথা কাটা গেল। তোর জেদটাই বেশি হলো? তুই আর আমার সামনে আসবি না!

দিদি সব সময় বই সামনে নিয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

একবার দিদি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, তারপর ধরা গলায় বললো মনি, তুই একবার ওবাড়ি গিয়ে বিপ্লবীর খবর নিয়ে আসবি? টুক করে ভোরবেলা একবার ঘুরে আসতে পারবি না?

দিদি আর আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় জীবনলালের নাম উচ্চারণ করি না। বলি বিপ্লবী, কখনো শুধু বি-বাবু।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে দিদির বন্ধু তসলিমাও তিন-চারদিন আসে না। তসলিমা দিদির প্রাণের বন্ধু, সে এলেই তো সব খবর পাওয়া যেতো। দু'জনের চোখের দেখা না হলে একটা দিনও কাটতো না, তসলিমাকেও কি এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে?

আমার পক্ষে লুকিয়ে চৌধুরী সাহেবদের বাড়ি যাওয়াটা এমন কি আর শক্ত? ভোরবেলা ছিপ হাতে নিয়ে মাছ ধরার নাম করে আমি চলে গেলাম দিঘির ওপারের জঙ্গলে।

একটা গুনগুন গান শুনে সেদিকে গিয়ে দেখি একটা বকুল গাছের নীচে ফুল কুড়োচ্ছে তসলিমা। দিদির বন্ধুকে তসলিমা আপা বলা উচিত, কিন্তু কেন জানি না, ছোটবেলা থেকে আমি ওকে নাম ধরেই ডাকি। দিদি অনেকবার বারণ করেছে কিন্তু তসলিমা আপত্তি করে না।

গাছতলায় আপন মনে গান গাইছে আর ফুল তুলছে তসলিমা। ওকে গান গাইতে কখনো দেখিনি আগে। আজ একটা হাল্কা লাল রঙের শাড়ি পরা, ঠিক ভোরের আকাশের মতন। তসলিমার গায়ের রং দিদির চেয়ে বেশি ফর্সা, মাথায় ঘন কালো চুল সব সময় ভিজে ভিজে মনে হয়।

প্রথমে আমাকে লক্ষ্যই করেনি তসলিমা, হঠাৎ চমকে ফিরে তাকালো।

তারপর। আমার হাতে বঁড়শি দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি রে মনি, তুই কি এই জঙ্গলে মাছ ধরতে এসেছিস নাকি?

আমি বললাম, আমাদের বাড়ির অতিথি তোমাদের বাড়িতে আছে। দিদি জিজ্ঞেস করলো, সে কেমন আছে?

তসলিমা তার লাল টুকটুকে ঠোঁট উল্টে বললো, ইস, ভারি তো দরদ! তোরা তো লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিস, এখন আবার খবর নিতে এসেছিস যে বড়ো!

তসলিমাকে আমি কোনোদিন এভাবে কথা বলতে শুনিনি।

আমি আবার বললাম, তুমি আমার দিদির কাছে আর আসো না কেন? তোমারও বুঝি বিয়ে ঠিক হয়েছে?

তসলিমা বললো, ভ্যাট! তোর দিদিকে তোর মা-বাবা বকে, আমি গেলে আমাকেও বকবে! কি বকবে না?

আমি চুপ করে রইলাম। মা আর বাবা দু'জনেরই মেজাজ খুব খারাপ। সবসময় নিজেরা ঝগড়া করে, আর দিদিকে শুধু বকে।

ওরা তসলিমাকেও বকুনি দিতে পারে কি না, তা বলা শক্ত।

আমি আর কিছু না বলে এগিয়ে যেতেই তসলিমা আমার কাঁধ ধরে বললো, এই শোন! রাণীকে বলিস, বিপ্লবী এখন ভালো আছে অনেক। ঘর থেকে বেরোয় না, তবে ঘরের মধ্যেই হাঁটে একটু একটু।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলে?

তসলিমা দু'দিকে মাথা নাড়লো।

—কেন তোমার সঙ্গে কথা বলে না?

—অমি তো ঐ ঘরে যাই না?

—কেন যাও না?

—আমাকে বারণ করা হয়েছে। আব্বু বলেছেন, কেউ যেন ওখানে ডিসটার্ব না করে। শুধু আমার বড় ভাইয়া খাবার দিতে যায়। আর তোর বাসুমামা আসে।

—তা হলে তুমি কী করে জানলে বিপ্লবী ঘরের মধ্যে হাঁটা চলা করে? তসলিমা ফিস করে হাসলো। তারপর বললো, এদিকে আয়, দেখবি?

বকুল গাছটার সামনের দিকে একটা ঝোপ। সেটার কাছে তসলিমা টেনে নিয়ে গেল আমাকে। ঝোপটা একটু সরাতেই দূরে চোখে পড়লো ওদের খামার বাড়িটা। তার জানলা খোলা। এই ঘরে আগে চৌধুরী সাহেবদের পাটের বাণ্ডিল থাকতো। কাছেই একটা গোয়াল।

জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই ফর্সা, লম্বা মানুষটি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ঘরের মধ্যে। হাতে একটা বই।

আমার মনে হলো, খামার বাড়িটার কাছে গিয়েই তো লোকটিকে দেখা যায়। এত লুকিয়ে চুরিয়ে দেখার দরকার কি লোকটি কি বাঘ না ভালুক?

তসলিমাকে ছেড়ে আমি ঝোপটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম আরও সামনে। এখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখের দাড়ি অনেক বেড়েছে। তসলিমা ঐ বিপ্লবীর ঘরে যেতে পারে না, আমি তো পারি।

আস্তে আস্তে গেলাম দরজার কাছে। দরজাটা ঠেললেও খুললো না, ভেতর থেকে বন্ধ। লোকটিকে ডাকতে আমার লজ্জা করলো। যদি জিজ্ঞেস করে কী চাই, তাহলে কী উত্তর দেবো?

একটু দূরে চৌধুরী সাহেবকে দেখতে পেয়েই আমি এক দৌড়ে চলে গেলাম বাগানের মধ্যে। তসলিমা তখনও ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জানলার দিকে।

দিন তিনেক বাদেই আমাদের বাড়ির উঠোনে শোনা গেল মোটর বাইকের গর্জন। তখন রাত আটটা। তসলিমার বড় ভাই মজিদ চেঁচিয়ে ডাকলো, বাসু, ও বাসু।

বাসুমামা নেমে এলো তার ছাদের ঘর থেকে। তারপর দু'জনে একটুক্ষণ কী কথা বললো। মোটরবাইক আবার স্টার্ট দিয়ে মজিদ ভাই বাসুমামাকে পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেল।

কী করে যেন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা জেনে গেলাম বিপ্লবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খামার ঘরে সে নেই। তার হ্যাণ্ড ব্যাগটাও নেই, কিন্তু তার চটি জোড়া ও দু'একটা বইপত্র পড়ে আছে।

প্রথমেই মনে হয়, কেউ তাকে চুপি চুপি এসে ধরে নিয়ে গেছে। সে নিজে থেকে চলে যাবে কেন? তার পা এখনো ভালো করে সারে নি। তা ছাড়া, বাবা আর বাসুমামাকে কিছু না জানিয়ে তার হঠাৎ চলে যাবার কী কারণ থাকতে পারে? সে এদিককার রাস্তাঘাটও কিছু চেনে না, রাত্তিরবেলা কোথায়ই বা যাবে?

দু'দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, এদিককার কেউ আর নৌকো চালাতে পারবে না। সব নৌকো থানায় জমা দিতে হবে। জাপানীরা ঢুকে

পড়েছে আসামে, এরপর তারা নেমে আসবে পূর্ব বাংলায়। জাপানীরা যাতে নৌকোয় যাতায়াত করার সুযোগ না পায়, সেই জন্য ইংরেজ সরকার হুকুম দিয়েছে, লুকিয়ে ফেলতে হবে সব নৌকো। চৌধুরীসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বিকেলবেলাতেও [illegible] হয়েছিল বিপ্লবী জীবনলালের। নৌকো বন্ধ হয়ে যাবার কথা শুনে সে কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখান থেকে চলে যাবার কথা তো একবারও বলেনি!

মজিদভাই আর বাসুমামা নদীর ঘাট ও আরও অনেক জায়গা খুঁজে এলো। কোথাও জীবনলালের কোনো চিহ্ন নেই। পুলিশে যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই রাত্তিরবেলা থানায় জমা রাখবে, তাই ওরা দু'জনে কী একটা ছুতোয় থানাতেও ঢুকে পড়েছিল। সেখানেও কিছু শোনা যায় নি।

বিপ্লবী জীবনলাল যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

বাসুমামা এক সময় গম্ভীর মুখে চলে গেল ওপরের ঘরে। বাড়িতে সবাই চুপচাপ। জীবনলাল সম্পর্কে কেউ কোনো আলোচনা করতে চায় না। বাবা শুয়ে শুয়ে এক মনে সিগারেট টানছে।

শুধু মিনু মাসির ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দিদি। মা সেখানে দিদির মুখখানা চেপে ধরে বলছে। চুপ কর, চুপ কর হারামজাদী! ও চলে গেছে বেশ হয়েছে, ও আমাদের কে? দিদির কান্না তবু থামে না।

দিদি শুধু একলা কাঁদে নি।

পরদিন দুপুরে পুকুরের পশ্চিম পাড়ের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখেছিলাম একটা অদ্ভুত দৃশ্য। কাছাকাছি দুটো গাছে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে দিদি আর তসলিমা। দু'জনেরই চুল খোলা। অন্য সময় ওরা দু'জনেই অনেক কথা বলে। এখন নিঃশব্দ। যেন ওদের সব গল্প ফুরিয়ে গেছে। দু'জনের চোখ দিয়েই কান্না

গড়াচ্ছে।

এই তা হলে প্রেম কিংবা ভালোবাসা ? বিপ্লবী জীবনলালের সঙ্গে দিদি কিংবা তসলিমা একটাও কথা বলেনি কখনো, চোখে চোখে চেয়ে হাসে নি, আড়ালে হাত ছোঁয় নি, তবু তু'জনেই কাঁদছে সেই মানুষটার জন্য ! সেই মানুষটা জানলোও না যে সে তু'জনকে কাঁদিয়ে গেল !

বিপ্লবী জীবনলালকে আমি এক মস্ত বড় বীরের আসনে বসিয়েছিলাম আমার মনের মধ্যে। হঠাৎ তার ওপর আমার রাগ হলো। রাগ, না হিংসে ? একজন আমার দিদি আর তসলিমা আমার চেয়ে অনেক বড়। তার সঙ্গে আমার প্রেম হবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু ওদের তু'জনকে কাঁদতে দেখে জীবনলালের প্রতি ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলতে লাগলো।

৪

ঠিক দু'দিন পরেই আমাদের বাড়িতে পুলিশ এলো।

কাল বৃষ্টি হয়েছে সারা রাত, আজও সকালবেলা টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা উঠোন পেরিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছি দৌড়ে দৌড়ে। বড় পিসিমা রান্নাঘর থেকে পাকা দালানে ছুটে যেতে গিয়ে একটা আছাড় খেলেন। তারপর আঁতকে উঠে বললেন, ওমা, ওখানে ওটা কী রে? সাপ নাকি?

পাকা দালানটার সামনে যে উঁচু বারান্দা, তার এক কোণে সন্ধ্যা মালতীর একটা ঝাড় হয়ে আছে। সেখানে কী যেন একটা জিনিস নড়াচড়া করছে আর ফটফট শব্দ করছে।

আমাদের উঠোনে সাপ আসা আশ্চর্য কিছু না। বর্ষার সময় হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় একটা বেশ লম্বা মতন সাপ। সেটাকে কেউ মারে না। সেটা নাকি বাস্তু সাপ। এছাড়াও দু'একটা সাপ দেখা গেছে অন্য সময়। একটা প্রায় সাদা রঙের সাপকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরেছেন বাসুমামা। সেটা ছিল দুধ-কেউটে, খুব বিষাক্ত।

পিসিমার চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম আমি আর রতন। আমি আধা-শহুরে আর রতন পুরোপুরি গ্রামের ছেলে। রতনের সাহস বেশি। রতন একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে সেই ঝোপটার মধ্যে খোঁজা-খুঁজি করতে লাগলো। একটু বাদেই সেখান থেকে সাপের বদলে বেরিয়ে এলো একটা কই মাছ!

কাল সন্ধেবেলা খুব মেঘ ডাকছিল, সেই সময় কই মাছটা উঠে

এসেছিল পুকুর থেকে। লতা পাতায় আটকে গেছে। এ রকম কই মাছ আমরা পুকুর ধারে আগে দেখেছি দু'একবার। কিন্তু উঠোন পর্যন্ত কখনো আসেনি। রতন আহ্লাদে হৈ হৈ করে উঠলো। ঝোপ ঠেলে দেখা গেল, সেখানে আরও দুটো কই মাছ রয়েছে। এরকম মিনি-মাগনা মাছ পেলে কার না আনন্দ হয়। বিধবা বড় পিসিমা পর্যন্ত খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠলেন, ওমা, কত বড় কই রে!

আমরা যখন কই মাছ নিয়ে মশগুল, তখন শম্ভু আমাদের কাছে এসে ফিসফিস করে বললো, এই, পুলিশ এসেছে জীবনলালকে খুঁজতে।

কই মাছ পাওয়ার চেয়েও পুলিশ দেখার উত্তেজনা অনেক বেশি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? কোথায়?

শম্ভু বললো, বৈঠকখানায় দাদুর সঙ্গে কথা বলছে!

আমি ছুটে গেলাম সেদিকে। বৈঠকখানার দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলাম। আমার বুকটা ধকধক করছিল, হঠাৎ আবার হতাশায় ভরে গেল। পুলিশ কোথায়? এ তো সাহাকাকু! এ আবার কী রকম পুলিশ?

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের বইগুলির প্রথম পাতায় যে ছবি থাকে, পুলিশের চেহারা আমার কল্পনায় সেইরকম ছিল। সাদা রঙের প্যান্ট ও কোট পরা, মাথায় শোলার টুপি, কোমরে রিভলভার, নাকের নিচে সরু গোঁফ।

আর সাহাকাকু ধুতির ওপর শার্ট পরা। কাদা মাখা চটি জুতো বাইরে খোলা। অতি নিরীহ চেহারা। আমার দাদু বসে আছেন খাটের ওপরে, হাতে গড়গড়ার নল, কাঁধের ওপর একটা চাদর ফেলা, ভুরু দুটো কোঁচকানো, তাঁর প্রায় পায়ের কাছে বসে আছে সাহাকাকু, অনেকটা কাচুমাচু ভঙ্গিতে।

সাহাকাকুদের বাড়ি এই গ্রামের অন্য প্রান্তে, খালের ধারে। ওদের বাড়ির একটা ছেলের নাম সুশান্ত, আমাদের স্কুলে পড়ে। সাহাকাকু এই গ্রামে থাকে না। মাদারিপুরে চাকরি করে এটাই জানি। সে যে পুলিশ তা কখনো শুনিনি। চেনাশুনো কেউ যে কখনো পুলিশ হতে পারে, তা আমার কল্পনাতেই ছিল না।

একটু বাদেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকলো বাসুমামা আর মেজমামা, দাদু আমাকে চোখের ইঙ্গিত করলেন বাইরে যেতে।

মেজমামা সাহাকাকুর চেয়ে বয়সে বড়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কী ব্যাপার, বিপুল। তুমি হঠাৎ এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে কী মনে করে ?

আমি দেখলাম, বিপুল সাহার জন্য চা আর জলখাবার গেল।

পুলিশ এলে বাড়িতে একটা হৈ চৈ হবার কথা, কিন্তু সেরকম কিছুই না। বসবার ঘরে কথা চলতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। আমার বাবা ঘরে বসে রইলো, পুলিশ সম্পর্কে তার যেন কোনো আগ্রহই নেই।

এক সময় আমরা আবিষ্কার করলাম, খাঁটি পুলিশও এসেছে, তারা বসে আছে বারোয়ারি পুকুরের ঘাটে। সাহাকাকুর সঙ্গেই এসেছে তারা। কিন্তু সাহাকাকু তাদের নিয়ে যায়নি বাড়ির মধ্যে। দু'জন অবাঙালী কনস্টেবল, খাঁকি পোশাক পরা। মাথায় লাল পাগড়ি। তাদের মাথার ওপর একটা বড় গাছ, তবু বৃষ্টির ছাঁট লাগছে তাদের গায়ে।

গ্রামের মধ্যে পুলিশ প্রায় দেখাই যায় না। আমি তো আগে কখনো দেখিনি !

পুলিশরা সব ব্রিটিশের চাকর, তারা বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেয়, সেইজন্য পুলিশের নাম শুনলেই আমাদের রাগ হয়। লাল পাগড়ি দুটো বৃষ্টিতে ভিজছে দেখে আমার মনে হলো, বেশ হয়েছে ! বেশ হয়েছে !

বাড়ির ভেতরে এসে দেখি বড় পিসিমা আর ঠাইরেন দিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছে। বাসুমামা কাছে দাঁড়িয়ে বেশ রাগের সঙ্গে বলছে, কী হচ্ছে কী? চুপ করো, চুপ করো!

বাসুমামার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আগে যখন বাসুমামা দু'তিন দিনের জন্য বরিশাল কিংবা ঢাকায় ফুটবল ম্যাচ খেলতে যেত, তখন জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে যেত ঐ ব্যাগে।

সাহাকাকু বাসুমামাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তার মানে অ্যারেস্ট? বাসুমামা জেল খাটবে?

ছুটে আবার বৈঠকখানা ঘরের কাছে চলে এলাম।

বড়দাদু গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সাহাকাকু বলছে, আপনি চিন্তা করবেন না, বড় কর্তা। বাসুকে কিছু জিজ্ঞেসবাদ করার জন্য নিয়ে যেতে হচ্ছে। ওপরওয়ালার হুকুম। আমি কী করি বলুন। ঐ জীবনলাল লোকটা ধরা পড়বেই দু'চার দিনের মধ্যে। তখন বাসু ফিরে আসবে!

বড় দাদু কোনো মন্তব্যই করলেন না।

সাহাকাকু আর বাসুমামা বাড়ির বাইরে আসার পর কনস্টেবল দু'জন বাসুমামার দু'দিকে দাঁড়ালো। সাহাকাকু আমার বড় দাদুর সামনে এতক্ষণ সিগারেট খেতে পারেনি, এবার একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললো, তুমি একটা নেবে নাকি, বাসু?

বাসুমামা দু'দিকে মাথা নাড়লো।

সাহাকাকু তবু জোর করে বললো, আরে নাও, নাও, একটা নাও। বাসুমামা নিজের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে বললো, আমি আমার নিজেরটা খাবো?

একটা ব্রিটিশের স্পাই-এর কাছ থেকে যে বাসুমামা সিগারেট নেয়নি, এজন্য হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো আমার।

আমি, শম্ভু আর রতন ওদের পিছু পিছু গেলাম অনেকখানি।

বাস্থমামা এক সময় মুখ ফিরিয়ে ধমক দিলো, এই তোরা আসছিস কেন? যা বাড়ি যা! পড়তে বোস গিয়ে!

আমরা অবশ্য সে বারণ শুনলাম না। গেলাম সেই খালধার পর্যন্ত। পুলিশের একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে। আরও দু'জন লোককে হাতে দড়ি বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে সেই নৌকোর ওপর। লোক দুটিকে চিনি না, মনে হয় মাঝি কিংবা জেলে।

বাস্থমামাকে অবশ্য সেই লোক দুটোর পাশে বসানো হলো না। সাহাকাকু তাকে নিয়ে গেল ছৈ-এর মধ্যে। সেখানে ঢোকার আগে বাস্থমামা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের বললো, মন দিয়ে পড়াশুনা করবি! যা, আর বৃষ্টিতে ভিজিস না!

নৌকোটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর শম্ভু আমার দিকে কুটিলভাবে তাকালো। তারপর বললো, মেসোমশাইটা কাপুরুষ! পুলিশ দেখে একবার ঘর থেকে বেরোলোই না!

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। ঠিক এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরছিল।

বাবা কেন বসে ছিল ঘরের মধ্যে। সাহাকাকুর তো উচিত ছিল আমার বাবাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া। বাবাই তো জীবনলাল মিশ্রকে নিয়ে এসেছে, এ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। বাস্থমামা তো জীবনলালকে আগে চিনতোই না। বাস্থমামার কী দোষ?

বাস্থমামা, বড় দাদুরা কি বাবার নাম উচ্চারণই করেনি? পুলিশ জানতেই পারেনি আমার বাবার কথা?

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা বিচারক আছে। যে-কোনো ঘটনা দেখলেই মানুষ তার ন্যায়-অন্যায় দিক সম্পর্কে একটা নিজস্ব মতামত ঠিক করে নেয়। এমনকি বাচ্চারাও তা করে।

রতন আর শম্ভুর মতে আমার বাবাই প্রকৃত অপরাধী। আমিও তা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। বাবার অপরাধ যেন

আমারও অপরাধ।

বাসুমামার বদলে আমার বাবা জেল খাটলে আমি গর্ব অনুভব করতাম।

আমিনুল চৌধুরী যখন বড়ো দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন বড়ো দাদু উঠোনে বসে স্নান করছেন। বড়ো দাদুর সান্নিপাতিকের ধাত আছে বলে তিনি পুকুরে ডুব দিয়ে আর স্নান করেন না। এক গামলা জল উঠোনে রোদ্দুরে রাখা হয় অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তিনি ঘটি দিয়ে সেই জল মাথায় ঢেলে স্নান করেন।

বড়ো দাদু বললেন, তুমি সাবধান হও, আমিনুল। তোমার বাড়িতেও পুলিশ যাবে এবার।

অবজ্ঞার সঙ্গে আমিনুল চৌধুরী বললেন, পুলিশ আমার কী করবে? আমারে থানায় ধরে নিয়ে যাবে? আপনি ঐ বিপুল সাহাকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন না কেন? তারপর কী হয় আমি দেখতাম!

বড়ো দাদু বললেন, সে সব দিন আর নেই। লীগ মিনিস্ট্রি বলে তুমি কিছুটা সুবিধা পেতে পারো, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করে··· তুমি মজিদকে অন্তত দূরে সরিয়ে দাও কিছুদিনের জন্য।

আমিনুল চৌধুরী বললেন, আমি মাদারিপুর যাচ্ছি। বাসুর জামিনের ব্যবস্থা করবো। আপনি চিন্তা করবেন না, ওকে ঠিক ছাড়িয়ে আনবো।

বড়ো দাদু বললেন, আমি বিপুল সাহাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এ কেসে জামিন পাওয়া যাবে না। ইণ্টারোগেশনের জন্য যতদিন খুশি আটকে রাখতে পারে। বাসু অন্য কারুর নাম বলবে না, জানি, তবু সাবধানের মার নেই, তুমি মজিদকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।

চৌধুরীসাহেব হাতের ছড়িটা দিয়ে উঠোনের মাটি খুঁড়তে লাগলেন

চিন্তিতভাবে। তারপর বললেন, আমি একবার মাদারিপুর ঘুরে আসি। অন্য কাজও আছে। সেখানে সব খবর পাবো!

সারা বাড়িটা নিঝুম হয়ে রইলো তুপুরবেলা।

বাসুমামা নেই বলে কেউ একটা কথাও জোরে জোরে বলে না। বাবা সারা দিনই বেরুলো না ঘর থেকে, বিছানায় শুয়ে রইলো উপুড় হয়ে।

শম্ভু স্পষ্টাপষ্টি আমাকে খোঁচা মারলেও বাড়ির অন্য কেউ কিন্তু একটুও অভিযোগ করলো না বাবার নামে। বিকেলে বড়ো দাতুর এক প্রজা দেখা করতে এসে এক হাঁড়ি রসগোল্লা দিয়ে গেল, বড়ো দাতু তার থেকে অনেকগুলো পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে।

কেউ কিছু বলে না, তবু আমার মনে হয়, সবাই যেন আমার দিকে কেমনভাবে তাকাচ্ছে। বিশেষত বড়ো পিসিমার মুখে যেন রাগ-রাগ ভাব।

বড়ো পিসিমা আমাদের সত্যিকারের পিসিমা নন। কী যেন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বিধবা হয়ে অনেকদিন থেকেই আছেন এ বাড়িতে। তিনিই এ বাড়ির কর্ত্রী বলতে গেলে। সবাই জানে, বড়ো পিসিমা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বাসুমামাকে।

সন্ধেবেলা ঘরে ঢোকার আগে পুকুরে গিয়ে পা ধুয়ে আসতে হয় আমাদের। এটাই নিয়ম। কোনোদিন পা না ধুয়ে এলেই মা বকুনি দিয়ে বলবে, রাস্তার পা নিয়ে ঘরে এলি যে!

'রাস্তার পা' ব্যাপারটা বেশ মজার। সারা দিন আমরা যতোই ঘোরাঘুরি করি, তখন তু'চারবার ঘরে ঢুকলেও আপত্তি নেই। শুধু সন্ধেবেলা পা না ধুলে ঘর অপবিত্র হয়ে যায়।

পুকুরঘাটে এসে দেখি, সেখানে বসে আছে দিদি আর তসলিমা। তুজনেই নীল রঙের শাড়ি পরা, আবছা অন্ধকারে যেন মিশে আছে। তসলিমার রং বেশি ফর্সা বলে তার মুখখানা জ্বলজ্বল করছে

চাঁদের মতন।

তসলিমা বললো, এই মনি, শোন! পুলিশ কী বললো রে? ওনাকে এখনো ধরতে পারেনি, তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম।

তসলিমা আবার বললো, ধরতে পারবেও না। ঠিক বুঝতে পেরে-ছিলেন যে এখানে পুলিশ আসবে। তাই আগেই পালিয়ে গেলেন। ওনাদের লুকিয়ে থাকার অনেক জায়গা আছে।

দিদি বললো, বাস্তুমামা আর মজিদভাই জানে উনি কোথায় আছেন।

তসলিমা বললো, আমার বড়ো ভাই জানে ঠিকই, কিন্তু আমাকে বলবে না কিছুতেই।

দিদি বললো, থানায় নিয়ে গিয়ে বাস্তুমামাকে টর্চার করবে!

তসলিমা বললো, আঙুলের নোখের মধ্যে নাকি আলপিন ঢুকিয়ে দেয়? বাস্তুভাই সহ্য করতে পারবে?

দিদি জোর দিয়ে বললো, পারতেই হবে। দেশের জন্য এইটুকু করবে না? একজন বিপ্লবীকে কি কেউ ধরিয়ে দিতে পারে?

মেয়ে ছুটোর ওপর আমার সাজ্ঘাতিক রাগ হলো, এরা শুধু জীবন-লালের কথাই ভাবছে। বাস্তুমামাকে যে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সেটা যেন কিছু না। এরা কী স্বার্থপর!

বাস্তুমামাকে পুলিশ মারবে? আঙুলের নোখের মধ্যে আলপিন ঢুকিয়ে দেবে? এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি আগে? বিপুল সাহা এই গ্রামের মানুষ, বড়ো দাছুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বাস্তুমামাকে নিজের সিগারেট দিতে চেয়েছিল। সে কখনো বাস্তুমামার গায়ে হাত তুলতে পারে?

অবশ্য থানায় তো সাহাকাকু একলা থাকবে না। সাহেব পুলিশও থাকবে। ইস, বাস্তুমামার কতো কষ্ট হবে! সবই তো আমার বাবার

জন্য !

রাত্রিবেলা মা বাবাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে লাগলো। বাবা এক-রকম ভাবে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে মা কান্না শুরু করলো। তারপর সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই বললো, তুমি আমার বাপের বাড়ির এই সর্বনাশ করলে ? এ বাড়িতে কোনোদিন পুলিশ আসেনি, আমার বাবার এতখানি অপমান, ছি ছি ছি ছি, নিরীহ ছেলে বাসু, সে কোনো দোষ করেনি, সাধারণ একটা চোরের মতন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল···এখন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে···

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর না দিয়ে রইলো বাবা। কিন্তু মা এক সময় জোর করে বাবার মুখখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, কেন, কেন, তুমি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলে ?

এবার বাবা খিঁচিয়ে উঠে বললো, তোমাদের জন্য ! তোমাদের জন্য ! আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে তোমাদের কী অবস্থা হতো ?

মা বললো, তা বলে তুমি আমার ভাইকে পুলিশের মুখে ঠেলে দেবে ?

বাবা বললো, বাসু এখনো চাকরি বাকরি করে না, বিয়ে থা করে-নি। আমার নাম একবার পুলিশের খাতায় উঠলে আমি আর জীবনে চাকরি পাবো না ! আসামে একটা কাজ পাবার কথা আছে।

মা বললো, বাসুর নাম পুলিশের খাতায় উঠলো। সে তাহলে আর চাকরি পাবে না সারা জীবন ? তুমি তার এতো বড়ো সর্বনাশ করলে ?

কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বাবা বললো বেশ করেছি ! আমার যা ইচ্ছে তাই করেছি।

মা আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে বললো, এমন একটা লোকের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছে, যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় দিতে পারে না। এতদিন পরেও আমাকে বাপের বাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকতে হচ্ছে! ওঃ মা গো, মা, তুমি কী করলে?

বাবা তেতো গলায় গর্জন করে বললো, হারামজাদি, তুই মড়াকান্না থামাবি? চুপ! চুপ কর বলছি।

মা বললো, কেন আমি চুপ করবো! তোমার কোনো মুরোদ নেই—

বাবা এবার লাফিয়ে উঠে ঠাস করে এক চড় কষালো মাকে। তারপর বাবা আমার দিকে রক্তচক্ষে তাকালো। যেন আমি মায়ের পক্ষ সমর্থন করতে গেলে বাবা আমাকে খুনই করে ফেলবে। বাবার ওরকম দৃষ্টি আমি আগে কোনো দিন দেখিনি। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। আমার বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো কান্না। আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম মাকে।

একটু বাদে বাবাও দেয়ালের দিকে ফিরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

পরদিন সকালে উঠে আর বাবাকে দেখতে পেলাম না। ভোর রাতেই বাবা কুটিশ্বরের নৌকোয় চলে গেছেন স্টিমার ধরতে। সেখান থেকে কলকাতা।

৫

বাসুমামার ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। ঐ ঘরের দখল নিয়ে দিদি আর তসলিমার সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়। দুপুরবেলা যখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন ওরা দু'জন ওখানে শুয়ে শুয়ে গল্প করে। আমরা ঢুকে পড়লেই দিদি বকুনি দিয়ে ওঠে, এই, তোরা এখানে কেন রে ? যা যা !

দু'দিন বাদেই শম্ভু দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলো।

শম্ভু বললো, কেন যাবো? এটা আমার কাকার ঘর। এখানে আমি পড়াশুনো করবো। বাবা বলেছে।

দিদি বললো, এটা তোর কাকার ঘর, আর আমার বুঝি মামার ঘর না ? যা ভাগ।

শম্ভু তবু গম্ভীরভাবে বললো, মামা বেশি আপন, না কাকা আপন ?

দিদি গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বললো, ওমা, এইটুকু ছেলের কী পাকা পাকা কথা ! বেশি আপন আর কম আপন কী রে ? ফের ঐ রকম কথা বললে একটা চাঁটি খাবি।

শম্ভু জেদীর মতন ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, আমি আমার কাকার ঘরে বসে পড়াশুনো করবো। আয় রে রতন, আয় রে, মনি !

আমি কোন্ দলে, দিদির না শম্ভুর ? দিদির মতন আমারও তো মামা হয় বাসুমামা। কিন্তু মেয়েদের দলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া শম্ভু আমার বেলা এ প্রশ্ন তুলতে চায় না, সে

আমার হাত ধরে টেনে ঘরটার ভেতরে নিয়ে এলো।
বাসুমামার ঘরে অনেক বই, সেই জন্যই এ ঘরটার ওপর আমারও লোভ আছে। বাসুমামা তার বইপত্রে হাত দিতে দিতো না।
তসলিমা খিলখিল করে হেসে বললো, মামা আপন, না কাকা আপন?
সে বেশ মজা পেয়েছে এই কথাটায়। বার বার হেসে হেসে বলতে বলতে এক সময় জিজ্ঞেস করলো, এই রানী, বল না, সত্যি কে বেশি আপন?
প্রশ্নটা কিন্তু সামান্য নয়। কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলাম, এই প্রশ্নটা বাড়ির অনেকের মনেই ঘোরাফেরা করছে। আমিও এই প্রথম টের পেয়ে গেলাম, বাবা-কাকা-জ্যাঠারা যত আপন, মামা-মেসো-পিসে-জামাইবাবুরা তত আপন হয় না। এটা শম্ভুর বাবার বাড়ি আর আমার মামার বাড়ি, এ দুটো এক নয়।
গত রবিবারের হাটে নাকি এক দানা চালও বিক্রি হয়নি। চাল পাওয়া যাচ্ছে না। নদী দিয়ে নৌকো চলে না, কোনো জিনিসপত্র আসে না বাইরে থেকে। এ বাড়ির গোলার ধান ফুরিয়ে এসেছে, আর ক'দিন পরে নাকি কেউ ভাত খেতে পাবে না। এখনই আমরা একবেলা শুধু ভাত খাই, অন্যবেলা রুটি। তাও পেটভরা ভাত নয়, খানিকটা মোটে ফেনা ভাত, আর অনেকখানি আলু সেদ্ধ। সেদ্ধ দিয়েই পেট ভরাতে হয়।
রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসেছি আমরা ভাই বোনেরা, ঠাইরেন-দিদি কাঁসার থালায় ভাত দিয়ে গেল, আমি মন দিয়ে আলুসেদ্ধ মাখছি নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, এময় সময় বড়ো পিসিমা আমার দিকে পেছন ফিরে টুক করে কী যেন দিলেন শম্ভু আর রতনের থালায়। ওরা দু'জন তাড়াতাড়ি সেটা ভাত দিয়ে চাপা দিলো।
তবু আমি ঠিক দেখতে পেয়েছি।

আমি বললাম, বড়ো পিসিমা, তুমি ওদের ঘি দিলে, আমায় দিলে না ?

বড়ো পিসিমা বকুনির সুরে বললেন, বেশি নাই ! এই শম্ভুটা ঘি ছাড়া ফ্যান ভাত খেতে পারে না, তাই ওকে একটু দিয়েছি।

আমি তবু নাছোড়বান্দার মতন বললাম, তুমি তো রতনকেও দিলে !

অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বললেন বড়ো পিসিমা। বললেন মোটেই না, শুধু শম্ভুকেই দিয়েছি !

শম্ভুটা স্বার্থপর, সে একমনে ভাত নাড়ছে, তাকাচ্ছে না আমার দিকে। রতন ওরকম নয়। সে বললো, ও বড়ো পিসিমা, মনিকেও একটু ঘি দাও !

দিদি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মধ্যে লজ্জা আর ঘৃণা মেশানো।

রতনের কথা শুনেই আমার বুকে প্রথম অপমান বাজলো। বুঝতে পারলাম, বড়ো পিসিমা ইচ্ছে করে আমাকে ঘি দেয়নি।

এবার আমার কাছে এসে ঘিয়ের বৈয়ামের মধ্যে কড়ে আঙুল ডুবিয়ে অতি সামান্য একটু ঘি তুলে আমার ভাতের ওপর ছিটিয়ে দিলেন বড়ো পিসিমা।

আমার কান্না পেয়ে গেল। ইচ্ছে হলো সেই ঘিটুকু তুলে মাটিতে ফেলে দিতে।

এটা শম্ভুর বাবার বাড়ি, কাকার বাড়ি। আর আমার এটা মামার বাড়ি, এটা আমাদের নিজেদের বাড়ি নয়। আমার কোনো কাকা কিংবা জ্যাঠামশাই নেই, আমার বাবা থাকে কলকাতায়। তা হলে আমরা কোথায় যাবো ?

বাবা অবশ্য কলকাতায় গিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল মাকে। তার মধ্যে আমার জন্যও একটা ছোট চিঠি ছিল। বাবা এখনো চাকরি

পায়নি। বাবা লিখেছে, চাকরি পেলেই আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কবে, কতদিন পরে ?

বড়ো দাদু বেশির ভাগ সময়েই থাকেন বৈঠকখানায়। আমরা ছোটরা কেউই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাই না। দিদিমাকে আমি চোখেই দেখিনি, তাঁর মৃত্যু হয়েছে আমার জন্মের আগে। সবাই বলে, আমার মাকে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। বড় মামাই সংসারের সব কিছু দেখাশুনো করেন। তিনি আগে তো বেশ হাসি-খুশি স্বভাবের ছিলেন, আমাদের সঙ্গে অনেক মজা করতেন। এখন আর ভালো করে কথা বলেন না। দিদি একদিন বড়ো মামার কাছে শম্ভুর নামে নালিশ করতে গিয়েছিল, বড়ো মামা বলেছেন, হ্যাঁ, ওপরে বাস্থুর ঘরে শম্ভু-রতনরা পড়াশুনো করবে, তোরা তো ওখানে না গেলেই পারিস !

বড়ো মামিমার কী অসুখ তা জানি না, তবে উনি সব সময় শুয়েই থাকেন। ঘর থেকে বেরোন না প্রায় বলতে গেলে। মাঝে মাঝে তাঁর খুব কাশি হয়। বড় মামিমাকে আমার বেশ ভালো লাগতো, কী মিষ্টি তাঁর গলার আওয়াজ। কিন্তু এখন জেনে গেলাম, ঐ বড়ো মামিমাই আমার মাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ওঁর নির্দেশেই আমাকে আর দিদিকে খাওয়ার পাতে ঘি দেওয়া হয় না।

বাস্থুমামা থাকতে এসব আপন-পর কিছুই বুঝিনি। বাস্থুমামা সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতো। বাস্থুমামা নেই বলেই সব কিছু বদলে গেছে। বাস্থুমামাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে আমার বাবার জন্য। আমার বাবাই এই সব কিছুর জন্য দায়ী !

আমিনুল চৌধুরী সাহেব মাদারিপুর থেকে খবর এনেছেন, বাস্থু-মামা সেখানকার থানায় নেই। তাকে কোথায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা কেউ জানে না।

দিদি আর মা সব সময় কান্নাকাটি করে তাই ঘরে থাকতেও আমার ভালো লাগে না। শম্ভুদের সঙ্গেও খেলতে ইচ্ছে করে না। ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, সারাদিন কিছুই করার নেই। পেটের মধ্যে সব সময় একটা খিদে খিদে ভাব। একসঙ্গে বেশি আলু সেদ্ধ খেতে ভালো লাগে না বলে, পকেটে সেদ্ধ আলু নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আর কাগজে মুড়ে খানিকটা নুন। খুব খিদে পেলে সেই আলু সেদ্ধ খাই যে-কোনো জায়গায় বসে।

নদীর ঘাটে অনেকগুলো নৌকো ডাঙার ওপর তোলা। আমাদের এদিককার নৌকোগুলো এখনও গবর্নমেণ্ট ধরে নিয়ে যায়নি, কিন্তু থানা থেকে বলে গেছে, কেউ নৌকো চালাতে পারবে না। ডাঙার ওপর তুলে তলার কয়েকটা তক্তা খুলে রাখতে হবে। জাপানীরা এলেই ডুবিয়ে দিতো সব নৌকো।

আমার এক এক সময় মনে হয়, এখন জাপানীরা এসে পড়লেই ভালো হয়। সব কিছু কেমন যেন এক ঘেয়ে হয়ে গেছে। জাপানীদের সঙ্গে আসবেন সুভাষ বোস। তাঁর একটা ছবি দেখেছি, মিলিটারিদের মতন পোশাক, চোখে চশমা, কোমরে তলোয়ার। সুভাষ বোস এলে ইংরেজদের কচুকাটা করবেন, ইংরেজের ধামা ধরা পুলিশদেরও ছাড়বেন না। ঐ সাহাকাকুটাকে নির্ঘাৎ ফাঁসিতে ঝোলাবে। ওই লোকটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

কুটিশ্বর আর নাদের আলিরা নদীর ধারে বসে জাল বানায় আর তো কোনো কাজ নেই। নতুন জাল বানিয়ে তাতে গাবের আঠা মাখাতে হয়। পাকা গাব খেতে খুব ভালো, কিন্তু গাছে উঠে পাড়তে যাওয়া খুব মুশকিল। বড় লাল পিঁপড়ের উৎপাত। নাদের আলি এক গাদা কাঁচা গাব পেড়ে এনেছে, সেগুলোতে বেশ সুন্দর গন্ধ।

নাদের আলি অনেক মজার মজার গল্প জানে।

একবার তাকে আলেয়া ভূত ধরেছিল। বড়ো মামাকে নিয়ে একবার সে দূরের কোনো বিলে মাছ আনতে গিয়েছিল। সেখানে বিলের মধ্যেই কোনো নৌকো বেঁধে থাকতে হয় দু'এক রাত। সে রকম এক রাতে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠেছিল আলেয়া ভূত। তার মুখ-খানা অবিকল একটা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ের মতন। সে কখনো হি হি করে হাসে আবার কখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হাতছানি দেয়। বিলের হাঁটু জলে নাদের আলি সেই আলেয়ার পেছনে ছুটেছে সারা রাত।

নাদের আলির আর একটা গল্প হলো জলের নীচে কামানের গল্প। এই নদী গিয়ে পড়েছে বড়ো নদীতে, সেখান দিয়েও অনেকটা গেলে বরিশাল শহর। এক এক রাত্তিরে সেখানকার নদী দিয়ে নৌকোয় যেতে যেতে গুম গুম করে কামানের শব্দ হয়। সেই শব্দ আসে জলের তলা থেকে। জলের নীচে কোনো একটা যুদ্ধ চলে। এককালে নাকি ওখানে দুটো রাজ্য ছিল। সব কিছু এখন জলে ডুবে গেলেও সেই দুই রাজা আজও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

গল্প শুনতে শুনতে সন্ধে হয়ে যায়।

নাদের আলি বিড়ি টানতে টানতে বললো, ও দাঠাউর, আমারে একবার কইলকাতায় নিয়ে যাবা? খুব দ্যাখতে ইচ্ছা করে।

আমি চুপ করে থাকি।

নাদের আলী আবার বললো, তোমার বাবা সেখানে মস্ত বড়ো চাকরি করেন। তোমাগো বাড়ি নিশ্চয় খুব বড়ো। এক কোণে আমারে থাকতে দেবা। আমি সার্কাস দ্যাখবো। ইস্টিমারের ভাড়া কত? তোমার বাবা ইচ্ছা করলেই আমারে নিয়া যাইতে পারে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, বাবা আসুক। এবার আমরা যখন যাবো, তোমাকেও কলকাতায় নিয়ে যাবো।

হঠাৎ একটা ছিপ নৌকা ঘাটে এসে ভিড়লো। তার থেকে নামলো তিনজন মানুষ। এদের সাহস তো কম নয়? পুলিশের হুকুম অমান্য করে নৌকো চালিয়ে এসেছে। তাহলে কি এরা নিজেরাই পুলিশ?

লোক তিনটি ওপরের বাঁধের রাস্তায় উঠে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজন আমার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো। জোরালো টর্চ ফেললো আমার মুখে। তারপর ইংরিজিতে কী যেন বললো তার সঙ্গীদের।

আমার বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। ইংরিজি হোক আর বাংলাই হোক, গলার আওয়াজ শুনেই চিনেছি জীবনলাল।

জীবনলাল একটু কাছে এসে বললো, এই যে খোকা তোমার নাম কী যেন? তোমাদের বাড়িতে একবার যাবো। তোমার বাবার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

আমার গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কথাই বেরুতে চায় না। অতি কষ্টে বললাম, আমার বাবা তো এখানে নেই।

জীবনলাল খানিকটা যেন হতাশ হয়ে বললো নেই? কোথায় গেছে।

আমি বললাম, কলকাতা।

—কবে গেছেন তিনি?

আমি হিসেব করে বললাম, প্রায় দেড় মাস আগে।

জীবনলাল তার সঙ্গীদের সঙ্গে ইংরিজিতে কী যেন আলোচনা করলো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, বাসুবাবুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, তাই না? সে সময় পুলিশ কি তোমাদের বাড়ি সার্চ করেছিল?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম। সাহাকাকু কিংবা তার সঙ্গের কনস্টেবলরা কেউ বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি।

অন্য একজন বললো, তোমাদের বাড়িতে যেতে হবে। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো তো!

আমি আর কী বলবো, যেতেই তো হবেই।

কিন্তু একটা কথা মনে পড়তেই পা যেন অসাড় হয়ে গেল আমার। আমার মামার বাড়ির কেউই জীবনলালকে পছন্দ করে না। আগের বার জীবনলালকে নিয়ে এসেছিল বাবা, এবার নিয়ে যাচ্ছি আমি। দোষ পড়বে আমার ওপরে। দাদু আর বড়ো মামা এর পর আমাকে নিয়ে কী করবেন, কে জানে?

অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে এগোতে লাগলাম আমরা। জীবনলাল বন্ধুর মতো আমার কাঁধে হাত রেখেছে। শিরশির করছে আমার কাঁধটা। প্রথম দিন জীবনলালকে দেখে আমার কী শ্রদ্ধাই না হয়েছিল। সে একজন বিপ্লবী। বন্দী রাজকুমার। যেন স্বপ্নের মানুষ। কিন্তু সে আমাদের জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে। তার জন্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বাসুমামা, সে এখন কোথায় কেউ জানে না। অনেকে বলাবলি করছে, পুলিশে যাদের ধরে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে আর কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জীবনলালের জন্যই বদলে গেছেন বড়োদাদু আর বড়ো মামা। মা আর দিদি সর্বক্ষণ ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদে। শম্ভুদের কাছে আমি পর হয়ে গেছি।

তবু আমার কাঁধের ওপর রয়েছে এমন একটা হাত, যে হাত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বন্দুক-পিস্তল চালিয়েছে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে একটা ছাদের পাঁচিল থেকে লাফ দিয়েছিল।

জীবনলালের পকেটে কি ওর পিস্তলটা এখনো আছে?

আমার শরীরটা কাঁপছে,আর বুকের মধ্যে দুম দুম শব্দ হয়েই চলেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে জীবনলাল বললো, খোকা, তুমি আগে

ভেতরে যাও। তোমার মাকে গিয়ে বলো, আমি একবার তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না। একটু পরেই চলে যাবো।

আমি এক ছুট্টে বাড়ির মধ্যে যেতে গিয়েও বাধা পেলাম। পুকুর ঘাট থেকে পা ধুয়ে আসছিল বড়ো মামা, অন্ধকারে মূর্তিগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে রে? কে ওখানে?

একসঙ্গে তিনটে টর্চ জ্বলে উঠলো।

বড়ো মামা বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, ডাকাত! ডাকাত!

জীবনলালের একজন সঙ্গী দৌড়ে গিয়ে বড়ো মামার বুকে একটা থাবড়া মেরে ধমক দিয়ে বললো, চুপ! একদম চ্যাঁচাবেন না! আমরা ডাকাত নই!

জীবনলাল বললো, ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। আমি জীবনলাল। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।

বড়ো মামা এবার হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনি কেন আমাদের সর্বনাশ করতে আবার এসেছেন? আমার ছোট ভাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। এবার আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে।

জীবনলাল বললো, আর কিছু হবে না। কেউ টের পায়নি। আমরা এক্ষুনি চলে যাবো।

বড়ো মামার চিৎকার শুনে বড়ো দাদু বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর হাতে একটা রামদা। এই রামদাটা তাঁর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো থাকে। এতখানি বয়সে তিনি ওটা তুলে ধরলেন কী করে কে জানে! ওটা এত ভারি যে আমি এক হাতে তুলতে পারি না।

বড়ো দাদু খড়ম ঠকঠকিয়ে কাছে চলে এলেন।

জীবনলাল কিংবা তাঁর সঙ্গীরা কেউ ভয় পেল না। তিনজন দাঁড়ালো পাশাপাশি, টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে।

জীবনলাল বললো, বড়োকর্তা, খুব প্রয়োজন আছে বলেই আমাকে একবার ফিরে আসতে হয়েছে।

বড়ো দাদু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, গেট আউট! গেট আউট ফ্রম মাই হাউজ!

জীবনলাল একটুও গলা না তুলে বললো, চলে যাবো, নিশ্চয়ই চলে যাবো। সন্তোষদা এখানে নেই শুনলাম। একবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বড়ো দাদু বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি কথা বলবে? ওসব এখানে চলবে না। আমার জীবন থাকতে তুমি আর এবাড়িতে ঢুকতে পারবে না।

জীবনলাল তবু কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো, শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। আজ ফতেপুরে একটা বোমা ফেটেছে, দু'জন লোক জাপানী স্পাই বলে ধরা পড়েছে, সব পুলিশ গেছে সেখানে। সেই সুযোগে আমরা এসেছি। একটা দরকারি কাজ সেরেই চলে যাবো।

জীবনলালের এক সঙ্গী বড়ো দাদুর একেবারে কাছে এগিয়ে এসে বললো, ঠাকুর্দা, আমি আপনার নাতির মতন, ঐ রামদা দিয়ে আমার গলা কাটবেন?

বড়ো দাদু এতো উত্তেজিত হয়ে গেছেন যে আর কিছু কথা বলতে পারছেন না। সেই লোকটি বড়ো দাদুর হাত থেকে রামদাটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে রাখলো।

আর একজন এসে হালকা সুরে বললো, খুব তেষ্টা পেয়েছে। ঠাকুর্দা, আপনার বাড়িতে এক গেলাস জলও খাওয়াবেন না?

জীবনলাল ভেতরে ঢুকে এসে উঠোনে দাঁড়ালো।

বৈঠকখানাঘরে আর রান্নাঘরে দুটো মাত্র হ্যারিকেন জ্বলেছে, আর কোনো ঘরে আলো নেই। কেরোসিন তেল একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সন্ধের সময় আমাদের পড়াশুনো বন্ধ। একটা গুজব

শোনা যাচ্ছে যে এরপর আর দেশলাইও পাওয়া যাবে না। এর মধ্যেই দেশলাইয়ের দাম খুব বেড়ে গেছে।

অবশ্য আজ প্রথম প্রহরেই চাঁদের আলো ফুটেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জীবনলালকে। এ বাড়িতে প্রথম যেদিন সে এসেছিল, তখন সে ছিল অসুস্থ, প্রায় মুমূর্ষু। আজ তার কী তেজী চেহারা। প্যান্টে গোঁজা ফুল শার্টের দুটো হাতা খানিকটা গুটোনো। পায়ে বুট জুতো। হাতে একটা লম্বা টর্চ।

জীবনলাল ঠিক কারুর উদ্দেশে নয়, এমনিই জিজ্ঞেস করলো, বাসু-বাবুর ঘর কোন্‌টা?

আমিই ছাদের ঘরটার দিকে হাত দেখালাম।

শম্ভু অন্ধকারে ভূতের ভয়ে সন্ধের পর আর ছাদে যায় না। দিদি, মিনুমাসি আর তসলিমাই সন্ধের সময় ছাদে বসে গল্প করে। আজ তসলিমা আসেনি, মিনুমাসি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে গত কাল। ওরা দু'জনে ছাদের পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম।

জীবনলালের পা-টা এখনো সম্পূর্ণ সারেনি। যদিও সে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো, তবু যে সে একটু একটু খোঁড়াচ্ছে, তা বোঝা যায়।

আমিও গেলাম ওর পিছু পিছু।

বাসুমামার ঘরে ঢুকে জীবনলাল দরজা বন্ধ করে দিলো। বেরিয়ে এলো ঠিক পাঁচ মিনিট পরে। ছাদের দিকে এগোতে গিয়েও মেয়ে দুটিকে দেখে থমকে গেল। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ওর মধ্যে কি সন্তোষদার স্ত্রী আছেন?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম।

আমার হাত ধরে টানতে টানতে আবার দৌড়ে নিচে এসে বললো, খোকা, তোমার মা কোথায়, শিগগির তাকে একবার ডাকো।

বড়ো দাদু এর মধ্যে উঠোনে চলে এসেছেন। খানিকটা ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে এনে বললেন, আমার মেয়ে বাইরে আসবে না। যা বলবার আমাকে বলো!

জীবনলাল বললো, আপনার সামনেই বলবো। কিন্তু কথাটা তাঁকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করবো।

বড়োদাদু জোর দিয়ে বললেন, না, সে তোমার সামনে আসবে না! সুধা, তুই ঘর থেকে বেরুবি না।

ততক্ষণে ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো কয়েক পা।

জীবনলাল এগিয়ে গিয়ে বললো, বৌদি, আপনার কাছে সন্তোষদা কি আমার জন্য কোনো জিনিস রেখে গেছেন?

মুখে কিছু না বলে মা ঘাড় নেড়ে জানালো, না!

জীবনলাল খানিকটা হতাশ হয়ে বললো, কোনো জিনিস রেখে যাননি? মা আবার ঘাড় নাড়লো।

জীবনলাল এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে বললো, মুখে কিছু বলুন! ব্যাপারটা খুব জরুরি। সন্তোষদা কিংবা বাসুবাবু আমার জন্য কোনো চিঠিও রেখে যাননি?

মা এবার আঁচলের খুঁট খুলে একটা চিঠি বার করে দিলো।

টর্চ জ্বেলে চিঠিটা পড়লো জীবনলাল। তার সঙ্গীদের দেখালো। তারপর উঠোনের এক কোণে যে বাতাবি লেবুর গাছটা, তার কাছে তিনজনেই দ্রুত চলে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। হাত দিয়ে মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করতে করতে একজন বললো, একটা শাবল লাগবে।

জীবনলাল মুখ তুলে বললো, একটা শাবল কেউ এনে দিন তো?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। কেউ নড়লো না। আমি জানিই না শাবল কোথায় থাকে।

এবার জীবনলাল কর্কশ ভাবে গর্জন করে বললো, কেউ একটা শাবল দিতে পারছেন না ? আমাদের সময়ের দাম নেই ?
তার এক সঙ্গী বললো, আমরা এ বাড়ির মধ্যে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আমাদের বন্ধুরা আপনাদের ছাড়বে না। তারা আপনাদের দায়ী করবে !
অন্যজন বললো, আমরা যে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি, সেটা বুঝি আপনাদেরও দেশ নয় ? ছি ছি ছি।
এ বাড়ির রাখাল ষষ্ঠি কোথা থেকে একটা শাবল নিয়ে এলো। বাতাবি লেবু গাছটা থেকে তিন চার হাত দূরে এক জায়গায় মাটি খানিকটা খুঁড়তেই ঠনাৎ করে শব্দ হলো। সেই গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জীবনলাল বার করে আনলো একটা রিভলভার।
আমার তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। একটা সত্যিকারের রিভলভার ? উঠোনের মধ্যে পোঁতা ছিল এতোদিন ? আমরা কেউ কিছু টের পাইনি ? শুধু মা জানতো, মা-ও আমাদের ঘুণাক্ষরে কিছু বলেনি ?
রিভলভারটার গা থেকে মাটি ঝেড়ে জীবনলাল সেটা পকেটে ভরলো। তারপর মায়ের কাছে এসে বসে পড়লো। মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো, বৌদি, আপনি ধন্য ! এদেশে আপনার মতন মহিলারা আছেন বলেই আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে ভরসা পাই।
পরের মুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে জীবনলাল একটা ছুট লাগালো। তারা তিন বন্ধু মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

৬

সে রাত্রেও দিদি মাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। এটা যেন অনেকটা খুশির কান্না। জীবনলাল যে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, এতেই তার খুব আনন্দ হয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে মাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে দিদি বলতে লাগলো, মা, তুমি কী ভালো! মা, তুমি কী ভালো!

জীবনলালের অস্ত্রটা বাবা ভয় পেয়ে পুকুরে ফেলে দেয়নি, মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। যাবার আগে মায়ের কাছে চিঠিতে সে কথা লিখে রেখে গেছে, মা-ও তো চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে পারতো! তা হলে আমার বাবা ঠিক কাপুরুষ নয়, মা-ও কম সাহসী নয়। শম্ভুর বাবা-মায়ের তুলনায় আমার মা-বাবা অন্যরকম!

কিন্তু মা যে বড়ো দাদুর কথার অবাধ্য হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তার ফল ভালো হলো না। বড়ো দাদুর মুখের ওপর কেউ কথা বলে না, তাঁর প্রতিটি কথাই বেদবাক্য। মায়ের এই অবাধ্যতার জন্য বড়ো দাদু তার সঙ্গে কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। মাকে তিনি কখনো ডাকেন না, মা কিছু কথা বলতে গেলেও তিনি উত্তর দেন না। মা একদিন কেঁদে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল, তবু বড়ো দাদু পা সরিয়ে নিলেন, একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না।

বড়ো মামা এই সুযোগে আরও খারাপ ব্যবহার করতে লাগলো আমাদের সঙ্গে। শম্ভু-রতনদের থেকে আমার আর দিদির খাওয়ার

সময় আলাদা হয়ে গেল। শম্ভু-রতনরা খায় নিজেদের ঘরে বসে, আমাদের খাবার দেওয়া হয় রান্নাঘরের বারান্দায়। ফ্যানাভাতও একদিন অন্তর একদিন। দিদির চেহারাটা শুকিয়ে কালিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো দিন দিন।

যে-রাতে জীবনলাল আসে, সে-রাতে তসলিমাকে খবর দেওয়া হয়নি বলে সে খুব রাগ করেছিল দিদির ওপর। খবর দেবার যে কোনো উপায় ছিল না, তা সে বুঝবে না। তসলিমা আর রাগ করে আসে না এ বাড়িতে।

আমি পুকুরের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরার জন্য ছিপ ফেলি। তসলিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হয়ে যায়। তসলিমারও বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি করার হুকুম নেই, একমাত্র আমাদের বাড়িতেই তার যাতায়াত ছিল। কিন্তু তসলিমা আমার দিদির মতন অত শান্ত নয়। সে বাড়ির নির্দেশ বিশেষ মানে না, বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

পুকুরের ওপারে তসলিমার বাবা আমিনুল চৌধুরী সাহেবের ডিঙিটা বাঁধা থাকে। কিছুদিন ধরে তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে তিনি আর রাত্তিরে দাবা খেলতে আসেন না। তাঁর ডিঙিতে অন্য কেউ চড়তে সাহস পায় না।

তসলিমা দুপুরবেলা বাগানে কুঁচফল কুড়োচ্ছিল। আমাকে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এই মনি, তুই ডিঙি চালাতে জানিস?

কোনোদিনই একা একা ডিঙি চালাইনি আমি। আমাদের মধ্যে শুধু রতনই পারে। শম্ভু আর রতন আজ সকালেই ওদের মামাবাড়ি গেছে, আমাকেও ওদের সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা ছিল। কিন্তু বড়ো মামিমার ইচ্ছে নয়, তাই শেষ মুহূর্তে বাদ দেওয়া হলো আমাকে।

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, এ আর জানতে কী লাগে? কতবার চালিয়েছি!

তসলিমা আরও কাছে এসে বললো, আমাকে নিয়ে যাবি? মাঝ-পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলবো।
আমাদের এই দিঘিটা এতো বড়ো যে কেউ কোনোদিন সাঁতরে পারাপার করতে সাহস পায় না। মাঝে মাঝে কচুরিপানার দাম, পদ্মবন কতো কী রয়েছে। এই পুকুরে নাকি ছুটো গজাল মাছ আছে ঢেঁকির সমান লম্বা। ছুপুরবেলা সেই গভীর কালো জল দেখলে ভয় ভয় করে।
কিন্তু একটা মেয়ের কাছে কি ভয়ের কথা জানানো যায়? আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমার আব্বুর নৌকোয় উঠলে বকবে না?
তসলিমা বললো, এখন কেউ দেখবে না। চল না!
ডিঙি নৌকোটা ঘাটে বাঁধা থাকলেও তাতে বৈঠা থাকে না। চৌধুরী সাহেব বৈঠাটা বাড়িতে নিয়ে যান। তসলিমা দৌড়ে গিয়ে ওদের গোলাঘর থেকে অন্য একটা বৈঠা নিয়ে এলো।
এ বৈঠাটা বেশ ভারি, তবু আমি সেটা নিয়েই নৌকোতে উঠে বাঁধন খুলে দিলাম। লাল রঙের একটা ছাপা শাড়ি পড়ে আছে তসলিমা, মাথার সব চুল খোলা, তার ফর্সা মুখখানা রোদ্দুরে ঝকঝক করছে।
প্রচণ্ড গরমের ছুপুর, এ সময় কেউ বাইরে থাকে না। সবাই বলে, 'ঠিক ছুপুরবেলা, ভূতে মারে ঠেলা।' ছুপুরবেলা তাই ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে সর্বক্ষণ মায়ের মন-খারাপ মুখখানা দেখতে আমার ভালো লাগে না। বরং কিছু পুঁটিমাছ ধরতে পারলে ঠাইরেনদি ভাজা করে দেবে।
তসলিমা বললো, জানিস, মনি, এই দিঘিতে একটা কালো বউ ডুবে মরেছিল?
সে কথা কে না জানে, সবাই জানে। কিন্তু এই সময় সে কথাটা

আমি মোটেই মনে আনতে চাই না।

তসলিমা বললো, সেই কালো বউটা যদি এখন পানির তলা থেকে উঠে আসে?

বুঝতে পারছি যে তসলিমা আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। তবু গা-টা ছমছম করছে আমার। কাছেই একটা বড়ো মাছ ঘাই দিতেই আমি কেঁপে উঠলাম।

তসলিমা হি হি করে হেসে উঠলো।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, আমি তসলিমাকে ভালোবাসি। বড়োদের বইতে যে-রকম ভালোবাসার কথা থাকে, সেইরকম। তসলিমা হলেই বা আমার দিদির বন্ধু, আমার থেকে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড়ো। তসলিমার হাসিমাখা মুখখানা দেখতে আমার এখন যে-রকম ভালো লাগছে, এরকম ভালোলাগা তো অন্য কিছুতে পাই না।

এই যে চিন্তা, এটাই যেন একটা গোপন পাপ। আমার সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কথাও বলতে পারছি না। কিছু বললেই যেন তসলিমা বুঝে ফেলবে। আমাকে একটা চাঁটি লাগাবে।

জলের মধ্যে বৈঠা ফেলে আমি টানছি, নৌকোর মুখটা এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে। কী করে নৌকোটা ঠিক সোজা নিয়ে যেতে হয়, সেই কায়দাটাই শেখা হয়নি আমার। নাদের আলি কিংবা কুটিশ্বরকে দেখেছি, বৈঠাটা একবার ডানদিকে, আবার বাঁ দিকে চালায়। সে রকম করতে গিয়ে নৌকোটা সম্পূর্ণ ঘুরে গেল।

তসলিমা বললো, এই ছ্যামরা তুই মোটেই বৈঠা বাইতে জানিস না।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। যে-ভাবেই হোক তসলিমাকে আমি পদ্মবনের কাছে নিয়ে যাবো।

তসলিমা জিজ্ঞেস করলো, তুই আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন ?

আমি জানি না, এর উত্তরে কী বলতে হয় । লজ্জায় মুখ নিচু করলাম ।

তসলিমা কিছু একটা বুঝতে পেরেছে, বুকের আঁচলটা ঠিক করে জড়িয়ে নিয়ে বললো, হুঁ, পাজি ছেলে !

কিন্তু সে মুখের হাসিটা মোছেনি ।

সেই সময় কোথা থেকে তসলিমাদের দিকের ঘাটে এসে দাঁড়ালো বদর । সে তসলিমার ফুফাতো ভাই হয় । অনেকটা আশ্রিতের মতন ওদের বাড়িতে থাকে, জমি-জমার কাজ দেখে ।

লুঙ্গির ওপর গেঞ্জি পরা, হাতে একটা লাঠি । সে হাঁক দিয়ে বললো, অ্যাই মনি, তুই ছায়েবের নাও খুলেছিস, তোর কতো বড়ো সাহস রে ! আয় ইদিকে আয় !

ঘাট থেকে আমরা বেশি দূর যেতে পারিনি, বড়ো জোর কুড়ি হাত । পদ্মবন এখনো অনেক দূর । বদরের ধমক শুনে আমি বৈঠা তুলে নিলাম !

তসলিমা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বদরের দিকে অগ্রাহ্যের দৃষ্টি দিলো। তারপর আমাকে বললো, ওর কথা শুনিস না । চল রে মনি, চল ।

কিন্তু আমি দোটানায় পড়ে গেলাম । বদর আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো, গায়েও খুব জোর । বদরের কথা কি অমান্য করা যায় ।

বদর আবার বললো, আয়, ফিরে আয় ! অসভ্য ছাওয়াল ! আমি ছায়েবকে এখনি সব বলে দেবো !

তসলিমা বললো, শুনিস না, ওর কথা শুনিস না । আমাকে তুই দুটো পদ্মফুল তুলে দিবি না ?

আমি আবার বৈঠাটা জলে নামাতেই বদর বললো, আমি সাঁতরে

গিয়ে টেনে আনবো কিন্তু।

আমাদের নৌকো বেশি দূর যায়নি, বদরের পক্ষে এসে ধরে ফেলা খুবই সহজ হবে। বদর একেবারে দিঘির কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি গুটোতে শুরু করেছে।

তসলিমা বললো, ভীতুর ডিম! ধুত! তোর সঙ্গে যাবো না!

তসলিমা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেই ছোট নৌকোটা এমন দুলে উঠলো যে আমিও তাল সামলাতে পারলাম না। আচমকা পড়ে গেলাম। এইটুকু সাঁতরে পাড়ে যাওয়া কিছুই না। কিন্তু নৌকোটার কী হবে? নৌকোটা কিন্তু ডোবেনি, উল্টো হয়ে গেছে। এ নৌকো সোজা করার সাধ্য আমার নেই।

বদর জলে নেমে পড়েছে, এখন সে দায়িত্ব নেবে।

আমার উচিত ছিল ঘাটে পৌঁছেই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া। ভিজে প্যান্ট-গেঞ্জি তাড়াতাড়ি পাল্টে ফেললে খানিকটা সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপ করা যেত। বদর চ্যাঁচামেচি করবেই, অনেককে, জানাবে।

কিন্তু আমি অপেক্ষা করলাম তসলিমার উঠে আসার জন্য। তসলিমা উঠতে চাইছে না। তার মাথায় আজ অবাধ্যতা ও দুষ্টুমি ভর করেছে, সে সাঁতরেই পদ্মবনের কাছে যেতে চায়। কিন্তু বদর অতি দক্ষ সাঁতারু। সে এক হাতে নৌকোটা ধরে অন্য হাতে তসলিমাকে জোর করে ঠেলে ঠেলে আনতে লাগলো পাড়ের দিকে।

ওপরে উঠে দু'জনেই রাগারাগি করতে লাগলো খুব। পরস্পর পরস্পরকে শাসাচ্ছে। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি বোকার মতন।

বদর হঠৎ বৈঠাটা তুলে আমাকে মারতে গেল। তারপর কী ভেবে বৈঠাটা ফেলে দিয়ে এক হাতে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে অন্য হাতে খুব জোরে আমাকে কষালো এক কান-চাপাটি থাপ্পড়। দাঁত কিড়মিড় করে কী যেন বললো।

তসলিমা ভিজে কাপড় নিঙড়োচ্ছিল, ছুটে এসে বদরকে এক ধাক্কা দিয়ে বললো, এই হারামজাদা, তুই ওকে মারছিস কেন রে ?

সেই থাপ্পড় খেয়ে আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল। সেই অবস্থাতেই মনে হলো, বদরের সঙ্গে গায়ের জোরে আমি বা তসলিমা কেউই পারবো না। তা ছাড়া ওদের বাড়ির অন্য লোক এসে পড়লে আমাকেই দোষ দেবে।

আমি প্রাণপণে এক দৌড় লাগালাম।

তসলিমার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা।

চৌধুরী সাহেবদের বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই আমার নামে নালিশ আসবে, সেই ভয়ে আমি সারা সন্ধে ঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। অন্যায়ের চেয়েও বেশি, একটা যেন পাপবোধ কাজ করছিল আমার মধ্যে। তসলিমার সঙ্গে আমি চৌধুরী সাহেবের নৌকোয় চেপেছি, এটা এমন বড় কিছু দোষ নয়, কিন্তু তসলিমা সম্পর্কে আমার যে ভালোবাসা-ভালোবাসা ভাব হয়েছিল, সেই জন্যই যেন আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

তবু তসলিমার মুখটা মনে পড়ছে বারবার। সে যেন ভোরবেলার আকাশের মতন সুন্দর। বারবার আমি মনে মনে বলছি, তসলিমা! তসলিমা! যদি আবার কোনোদিন ও আমাকে নৌকো নিয়ে পদ্ম-বনে যেতে বলে, শত শাস্তির ভয় থাকলেও আমি ঠিক যাবো।

আমার নামে কেউ নালিশ করতে এলো না। কিন্তু এরপর দ্রুত অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেল।

বড়ো মামা আর আমার মা পিঠেপিঠি বয়েসী। দু'জনেই দু'জনকে তুই করে কথা বলে। এক সময় ওদের খুব ভাব ছিল। এখন মামিমার ভয়ে বড়ো মামা আমার মায়ের সঙ্গে আর তেমন ভালো করে কথা বলে না।

রাত্তিরবেলা বড়ো মামা আমাদের ঘরের সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে বললো, সুধা, একবার শোন তো !

হ্যারিকেনের বদলে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে ঘরে। তাতে মাঝে মাঝেই চিটপিট চিটপিট করে শব্দ হয়। সেই আলোতেই মা আমার একটা হাফ শার্ট শেলাই করছিল। বাবা এবার নতুন জামাকাপড় আনেনি, আমার জামা কমে গেছে।

ডাক শুনে মা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

বড়ো মামা বললো, হ্যাঁরে, সন্তোষ চিঠিফিটি কিছু লিখেছে? কলকাতায় গিয়ে কী করছে, জানিস কিছু ?

মা খুব ধীর গলায় বললো, না।

এ গ্রামের পিওনের নাম বরোদা। চিঠি দিতে এলে সে দু'খানা বাতাসা আর জল খায়, একটুখানি জিরিয়ে নেয়। আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করে। বেশ ভালো লাগে মানুষটাকে। বরোদা কিন্তু চিঠি থাকলেও কোনোদিন আমাদের মতন ছোটদের হাতে চিঠি দেয় না। চিঠি সে দেবে বড়ো দাদুর হাতে। যেন তাঁর জন্য সে বিশেষ এক উপহার এনেছে।

বরোদাকে দূর থেকে আসতে দেখলেই আমি ছুটে যাই। অধিকাংশ দিনই বরোদা আমাদের বাড়িতে আসে না। তবু আমি জিজ্ঞেস করি, আমার নামে চিঠি আছে ? আমার মায়ের নামে?

বরোদা কক্ষনো না বলে না, মুচকি মুচকি হেসে বলে, আসবে, আসবে। পরের ডাকেই আসবে। তোমার বাবার চিঠি এখন কল-কাতা থেকে রেলে চেপেছে, তারপর ইস্টিমারে চাপবে···।

সুতরাং মায়ের নামে এর মধ্যে চিঠি এসেছে কি না, সেটা বড়ো মামা ভালোই জানে। বাবা এখান থেকে চলে যাবার পর মোটে একটা চিঠি লিখেছিল তা সবাই জানে।

বড়ো মামা বললো, খুবই চিন্তার ব্যাপার। তোরাই বা এখানে

কতদিন পড়ে থাকবি ! সন্তোষ কলকাতায় একা থাকবে, চাকরি-বাকরি খুঁজবে, আবার রান্নাবান্না করে খাবে, ওর কষ্ট হবে খুব। তুই এক কাজ কর, সুধা। সন্তোষকে একটা চিঠি লেখ, সে যাতে এসে তোদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। আমি কাল মাদারিপুর যাবো, এর মধ্যে চিঠিটা লিখে রাখিস। মাদারিপুর থেকে পোস্ট করলে চিঠি তাড়াতাড়ি যাবে।

মা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো বড়ো মামা ফিরে যাচ্ছে, তখন মা ডেকে বললো শোন্ দাদা। আমি ঠিক করেছি, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি নিজেই চলে যাবো।

বড়ো মামা খানিকটা চমকে গিয়ে বললো, চলে যাবি ? কোথায় চলে যাবি ?

মা মৃদু গলায় বললো, কলকাতায় !

বড়ো মামা বললো, তুই একা একা কলকাতায় যাবি কি ? দূর, তা হয় নাকি ? বাবা যেতেই দেবে না। এতো তাড়াতাড়ির কিছু নেই। তুই বরং চিঠি লেখ। সে এসে নিয়ে গেলেই ভালো। বুঝলি না, এতদিন বউ ছেলে-মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখলে লোকে ওরই বদনাম দেবে।

ঘরের মধ্যে এসেই মা 'কার' থেকে গোলাপ ফুল আঁকা টিনের তোরঙ্গটা নামালো। তারপর জামা কাপড় ভরতে লাগলো তার মধ্যে। মায়ের চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে,আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না, তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় করে।

আমার কিন্তু আনন্দই হলো খুব। কলকাতায় যাওয়া হবে ! কলকাতা মানেই সব কিছু নতুন। মামাবাড়িটা যে আমাদের নিজের বাড়ি নয়, দিন দিন এই অনুভূতিটা আমার গায়ে বিছুটির মতন বিঁধছিল।

দিদিও উঠে এসে মাকে বাক্স গুছোতে সাহায্য করতে লাগলো।

দিদি আর মা কোনো কথা বললো না, তবু ওদের দু'জনের মধ্যে কী যেন একটা বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।

পরদিন সকালে মা আমাকে বললো, মনি, আমার সঙ্গে একটু চল্ তো।

মাকে আমি কখনো পায়ে হেঁটে গ্রামের মধ্যে ঘুরতে দেখিনি। কোনো বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলে অনেকে মিলে দল বেঁধে যায়। একটু দূরে হলে নৌকো।

মাথায় অর্ধেক ঘোমটা দিয়ে মা আমার সঙ্গে চলে এলো বাড়ির বাইরে। বেশি রোদ ওঠেনি এখনও। শেষ রাতের দিকে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল, ঘাসগুলো ভিজে ভিজে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছো, মা ?

মা বললো, চল না। রায় জ্যাঠাদের বাড়িতে একটু যাবো। তুই যেন খবর্দার, ও বাড়িতে জল খেতে চাইবি না।

এ গ্রামের সবাই জানে যে রায়দের বাড়িতে গিয়ে কেউ জল খেতে চাইলেই সঙ্গে দু'তিন রকম মিষ্টি দেয়। একদিন ইস্কুলে হাফ-হলি-ডে হয়েছিল, আমরা দশ বারোজন ছেলে মিলে ও বাড়ির ঠাকু-মার কাছে জল খেতে চেয়েছিলাম, সবাই মিষ্টি পেয়েছিলাম।

উঁচু রাস্তার দু'ধারে ধানক্ষেত। এক পাশে একটা ছোট খাল সঙ্গে সঙ্গে চলে। এক জায়গায় একটা বড় অশথ গাছ। অন্য সময় এই গাছটার তলা দিয়ে যেতে আমার একটু ভয় ভয় করে। এই গাছে তক্ষক আছে।

বাড়ির সামনের দালানে এক বৃদ্ধ বসে হুঁকো টানছেন। খালি গা, ধুতিটা হাঁটুর ওপর তোলা, বুকের সব লোম পাকা।

তিনি আমাদের দেখে খানিকটা অবাক হলেও মুখে বললেন, কে রে ? সুধা নাকি ? আয় আয় ! কেমন আছিস রে ? রোগা হয়ে গেছিস মনে হয় ?

মা সেই বৃদ্ধের পায়ের ধুলো নিয়ে বললো, জ্যাঠামশাই, শান্তির সাথে একটু দেখা করবো।

বৃদ্ধ হাঁক দিলেন, শান্তি, ও শান্তি। একবার এদিকে আয় তো!

তারপর থেমে গিয়ে বললেন, তুই ভিতরে যা না, সুধা। ভিতরে যা!

ভেতরে উঠোনের পাশে একটা বারান্দায় তরকারি কুটছে দু'জন মহিলা। মাকে দেখে হাসি ঝলমল করে উঠলো তাদের মুখে। একজন বললো, ও মা, সুধা, আজ কোন্‌দিকে সূর্য উঠলো রে?

মা বললো, শান্তি, তোর সাথে আমার একটা কথা আছে। তুই খুলনা ফিরে যাচ্ছিস?

দু'জন মহিলার মধ্যে যে একটু মোটা মতন, সে বললো, হ্যাঁ রে, যেতেই হবে। আমার শাশুড়ির খুব অসুখ। এখন তখন অবস্থা।

মা জিজ্ঞেস করলো, যাবি কী করে? এখন নাকি নৌকো চলে না?

শান্তি বললো, সে সব ছোটকাকা জানে। ছোটকাকা আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

তরকারির বঁটি কাত করে শুইয়ে রেখে শান্তি উঠে দাঁড়ালো। তখন বোঝা গেল তার পেটটা অনেকটা উঁচু। শিগগিরই বাচ্চা হবে।

আমরা একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। আমাকে জল চাইতে হলো না, আমার জন্য মিষ্টি এসে গেল।

শান্তি ডেকে আনলো তার ছোটকাকাকে। আমার বাবারই বয়েসী মানুষ, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। ইনি খুব পুজো-টুজো করেন। কেউ কেউ বলে, এই পরমানন্দ রায় একজন কাপালিক। আমি এর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' বইটা পড়ে ফেলেছি। কাপালিক শুনলেই আমার সেই চেহারাটা মনে পড়ে। পরমানন্দ রায়ের চেহারা অবশ্য সে রকম ভয়ঙ্কর কিছু নয়। কথা বলেন নিচু গলায়।

মা তাঁকেও প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো, পরমানন্দকাকা, আপনি শান্তিকে খুলনা পৌঁছোতে যাবেন? যাবেন কী করে? নৌকো তো চলে না।

পরমানন্দকাকা বললেন, স্টিমার সার্ভিস তো বন্ধ হয়নি। ফতেপুর থেকে স্টিমার ধরা যায়।

মা বললো, কিন্তু ফতেপুর পর্যন্ত যাওয়া যাবে কেমন করে? এইটুকু তো নৌকোয় যেতে হবে?

পরমানন্দকাকা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন, সে হয়ে যাবে একটা ব্যবস্থা। পুলিশের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে। এখন নৌকো যাচ্ছে দু'চারখানা। অত কড়াকড়ি নেই। জাপানীরা বোধ-হয় এলো না শেষ পর্যন্ত। বার্মায় জাপানীরা ইংরেজদের হাতে মার খেয়েছে খুব। সুভাষবাবু আন্দামানের দ্বীপ স্বাধীন করেছিলেন শুনেছিস তো? আবার নাকি বোমা খেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে-ছেন।

মা এসব কথা মন দিয়ে না শুনে খানিকটা অস্থিরভাবে বললো,তা হলে খুলনা পর্যন্ত যাওয়া যায়? ট্রেনও বন্ধ হয়নি নিশ্চয়ই?

পরমানন্দকাকা বললেন, ট্রেন তো কোনোদিনই বন্ধ হয়নি।

—পরমানন্দকাকা, শান্তির সাথে সাথে আমাকেও নিয়ে যাবেন।

—তোকে নিয়ে যাবো? তুই কোথায় যাবি? তুই খুলনা যাবি কী করতে? সন্তোষ কি এখন খুলনায় থাকে নাকি?

—না, সে আছে কলকাতায়।

—কলকাতায়? আমি তো অতদূর যাবো না!

—আপনি খুলনা থেকে আমাদের ট্রেনে তুলে দেবেন। আমরা শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে নামবো।

—তুই বলিস কী রে, সুধা! সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ থাকবে না, তুই ট্রেনে করে যাবি? তা কি হয় নাকি?

—সঙ্গে আমার ছেলে থাকবে। ও তো এখন বড় হয়েছে।

—এই মনি ? ওর কত বয়েস, চোদ্দ হয়েছে ? না রে, তা হয় না। ঐটুকু ছেলে তোদের সামলাবে কী করে ? পথে কত রকম আপদ-বিপদ হতে পারে। ধর যদি ট্রেনটা হঠাৎ কোথাও থেমে যায় ? আর গেলই না। যুদ্ধের সময় কিছুই বলা যায় না। সন্তোষ এসে তোদের নিয়ে যায় না কেন ?

—সে আসতে পারবে না। ছুটি নেই। পরমানন্দকাকা, আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকে যেতেই হবে।

মা জেদ ধরে রইলো। তর্ক-বিতর্ক চললো অনেকক্ষণ। শান্তিমাসি যোগ দিলো মায়ের পক্ষে। সে মায়ের মনের কথাটা ঠিক বুঝেছে। সে বললো, আমারও মনে হয় সুধার এখন কলকাতায় চলে যাওয়াই ভালো।

পরমানন্দকাকা বললেন, যুদ্ধের সময় কত মানুষ কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। আর তোরা সাধ করে যেতে চাস ? ঠিক আছে, ছাখ, তোর বাবা কী বলেন !

বাড়ি ফেরার পর বড়ো দাদুর সঙ্গে মায়ের কী কথা হয়েছিল, তা আমি শুনিনি। কিন্তু মায়ের বাক্স গুছোনো চলতে লাগলো।

বড় মামা মাদারিপুর গিয়েছিল পায়ে হাঁটা রাস্তায়। ফিরতে একদিন লেগে গেল। বাড়িতে এসেই চিৎকার করে বললো, শনি ! শনি ঢুকেছে বাড়িতে। এবার আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। যেদিন থেকে সন্তোষ ঐ লোকটাকে নিয়ে এলো···

বড় মামা কোথা থেকে খবর পেয়েছে যে বাসুমামাকে বিহারের কোন্ জেলে যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জেলখানাটা নাকি নরক কুণ্ডের সমান। কোনো বন্দীই সেখানে ছ'মাসের বেশি বাঁচে না।

ছোট ভাইয়ের শোকে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো বড়ো মামা

আর অভিশাপ দিতে লাগলো আমার বাবার নামে। মা, আমি আর দিদি আমাদের ঘরের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। আমাদের কারুর মুখে কোনো কথা নেই। ঠাইরেনদিদি দু'বার ডাকতে এলেও খেতে গেলাম না আমরা কেউ। শেষ পর্যন্ত বড়ো পিসিমা আমাদের দরজার সামনে এক থালা চিঁড়ে আর খানিকটা গুড় রেখে গেল।

অনেকদিন পর সেই সন্ধেবেলা আমিনুল চৌধুরী সাহেব দাবা খেলতে এলেন বড়ো দাদুর সঙ্গে। তিনিজানালেন যে তসলিমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আর দশদিন পর শুভকাজ।

আমাদের অবশ্য সে পর্যন্ত থাকা হলো না। আমাদের যাবার দিন ঠিক হয়েছে শনিবার।

দিদি এর মধ্যে তসলিমার সঙ্গে দেখা করেছিল কিনা আমি জানি না। বদরের ভয়ে আমি আর ঐ বাড়ির দিকে যাইনি। তা ছাড়া আমার শরীরে তখন অন্য উত্তেজনা। অন্যদের সামনে মা আমাকে পুরুষ মানুষ বলেছে, আমি বড় হয়ে গেছি।

খুলনা থেকে ট্রেনে চাপার পর আমিই মা আর দিদির অভিভাবক হবো।

যাওয়ার দিন সকালে বড়ো পিসিমা আমাদের পেট ভরে ভাত খেতে দিলেন। সঙ্গে বেঁধে দিলেন চিঁড়ে-মুড়ি আর নারকোল নাড়ু। অসুস্থ বড়ো মামিমা পর্যন্ত দরজার কাছে উঠে এসে বললো, সাবধানে যেও! মনি, ট্রাঙ্ক আর বেডিং-এর দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখবি। পৌঁছেই চিঠি দিবি কিন্তু।

শুধু বড়ো দাদু একবারও বাইরে এলেন না। আমি, মা আর দিদি তাঁর ঘরে গেলাম প্রণাম করতে। তিনি খাটে শুয়ে আছেন পাশ ফিরে। একটা কথাও বললেন না আমাদের সঙ্গে। মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেও মুখ চাপা দিলো। ধরা গলায় বললো, বাবা, যাচ্ছি।

বড়ো দাদু শুধু একটা হাত উঁচু করলেন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। মা দাঁড়িয়ে রইলো তবু। কিন্তু আমার অস্থির অস্থির লাগছে। খালি মনে হচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব। ফতেপুর থেকে স্টিমার যদি ছেড়ে দেয়!

আমি মায়ের আঁচল ধরে টানলাম।

দিদিও ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছে। দিদির কান্নার কোনো মানেই আমি বুঝতে পারলাম না। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে দিদিরও কষ্ট হচ্ছে নাকি? আমার তো কষ্ট হচ্ছে না। আমরা তো কলকাতায় যাচ্ছি, বাবার বাড়ি। সেটা আমাদের নিজের বাড়ি।

শম্ভু আর রতনের সঙ্গে দেখা হলো না, ওরা ওদের মামার বাড়ি গেছে। মাছ ধরার ছিপটা আমার নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওটা শম্ভু কিংবা রতনের নয়, আমার নিজস্ব। কিন্তু মা নিতে দিলো না। কলকাতায় ছিপ কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু কতো দুপুরবেলা ঐ ছিপটাই ছিল আমার বন্ধু। মাছ ধরার কাজে না লাগলেও ওটা তো কলকাতায় আমাদের ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া যেত!

নদীর ঘাটে শান্তি মাসিরা পৌঁছে গেছে আমাদের আগেই। শান্তি মাসির মেয়ে করবীকে অনেকদিন পর দেখলাম। করবীর কথা মনেও ছিল না। করবী ঘর থেকে বেরোয় না, কারণ সে বোবা। তার আর সবই ঠিক আছে, তার নাক, চোখ আমার দিদির চেয়েও সুন্দর, তবু ভগবান কেন তাকে বোবা করেছে? আহা, এই পৃথিবীতে করবীর একজনও বন্ধু নেই।

আমাদের নৌকো লাগবে না, রায়বাড়ির বড়ো নৌকোতেই আমাদের জায়গা হয়ে যাবে।

নাদের আলি আজও জালে গাবের আঠা লাগাচ্ছে। খালি গা, কী চওড়া তার বুক, দু'হাতের মাস্‌ল যেন পাথর। তার গায়ের রং কাঠ কয়লার মতন, কিন্তু যখন সে হাসে, তার দাঁতগুলো ঝকঝক করে।

ঠিক যেন সাদা ফুলের মতন তার দাঁত।

নাদের আলি বললো, ও দাঠাউর, কইলকাতায় চল্‌লা ? আমাদের নিয়া গ্যালা না ? বাঃ বেশ বেশ। আমারে কইলকাতা দেখাইবা যে কইছিলা ?

এই প্রথম আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। নাদের আমাকে খুব ভালোবাসে। তার কলকাতা দেখার এতো শখ, আমারও ইচ্ছে করে তাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যেতে। কিন্তু আমার কথা কি কেউ শুনবে ?

কোনো রকমে বললাম, আবার তো আসবো নাদের ভাই ! সেই-বার তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবো দেখো !

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বড়ো হয়ে যখন আমি চাকরি করবো, তখন এখানে এসে নাদেরকে আমি ঠিক কলকাতায় নিয়ে যাবো। ওকে চিড়িয়াখানা আর মনুমেণ্ট দেখাবো। সেই সময় আমার পকেট ভর্তি টাকা থাকবে, তখন তো আমায় কেউ বারণ করতে পারবে না !

তখনো আমি জানি না, নাদের আলির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। নাদের আলির কোনোদিনই কলকাতায় আসা হয়নি !

নৌকো ছাড়ার পর আমি ছইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু-ক্ষণের মধ্যেই আমাদের ঘাটটা মিলিয়ে গেল। অস্পষ্ট হয়ে গেল মামাবাড়ির গ্রাম।

একটা শুশুক ভুস করে মাথা তুললো আমাদের নৌকোর পাশেই। এত কাছ থেকে কখনো শুশুক দেখিনি। ঠিক যেন মানুষের মতন মুখ। জলের তলায় কি শুশুকদের ঘরবাড়ি আছে ?

পরমানন্দ কাকা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। একজন মাঝিকে বললেন, ওরে, একটু তামাক সাজ তো !

আমার বয়েসী একটি মাঝি টিকে ধরিয়ে হুঁকো-কল্কে দিয়ে গেল

তাঁকে। পরমানন্দ কাকা গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো করে টানছেন। আর আগুনের ফুলকি উড়ছে। তাঁর মুখভর্তি দাঁড়ি গোঁফ। আমার ভয় হচ্ছে, ঐ আগুনের ফুলকিতে তাঁর দাড়িতে না আগুন লেগে যায়! আবার একথাও মনে হচ্ছে, একবার একটু লাগুক না আগুন, বেশ মজা হবে!

পরমানন্দ কাকা মাকে বললেন, বুঝলি সুধা, সন্তোষকে তার করে দিয়েছি। সে খবর পেয়ে যাবে। তোর কোনো চিন্তা নেই। আমি নিজে ট্রেনে উঠিয়ে দেবো তোদের তিনজনকে।

মা থুম মেরে বসে আছে। চোখ দুটো ফাঁকা ফাঁকা। দিদি বসে আছে করবীর পাশে। শান্তি মাসি ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে।

দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম ফতেপুর।

স্টিমার ঘাটের কাছেই এক জায়গায় মানুষজনের দারুণ ভিড়। আর গোলমাল। মনে হচ্ছে কী যেন সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার হয়েছে ওখানে।

পাশ দিয়ে অন্য একটা নৌকো যাচ্ছে, পরমানন্দ কাকা হেঁকে সেই নৌকোর মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন, ও মিঞা ভাই কী হয়েছে ওখানে?

সে একগাল হেসে বললো, ডাকাইত! কয়টা ডাকাইত ওখানে ধরা পড়েছে!

ডাকাত শুনেই তাদের দেখার খুব কৌতূহল আমার। বাসুমামার কাছে ডাকাতের অনেক গল্প শুনেছি। আমাদের মামা বাড়িতেই অনেকদিন আগে একবার ডাকাত পড়েছিল। তারা সারা গায়ে ভুশো কালি মেখে আসে, কপালে থাকে সিঁদুরের ফোঁটা আর মাথায় ফেট্টি বাঁধে। তাদের হাতে থাকে রামদা আর তরোয়াল! সব ডাকাতই খুব লম্বা হয়।

পরমানন্দ কাকা আমাদের মাঝিকে বললেন, তুই ওদিকে যাইস

না। নাও ঘুরা। ইস্টিমারের পিছন দিক দিয়া যা!

তারপর মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, টাকা দে, সুধা। টিকিট কিনে আনি। তারপর এই ধার দিয়ে আমরা ইস্টিমারে উঠবো।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তাই তো, স্টিমারে উঠতে টিকিট লাগে। ট্রেনেরও টিকিট কাটতে হবে। কিন্তু মা টাকা পাবে কোথায়? এর আগে প্রত্যেকবার যাওয়া-আসার সময় বাবা টিকিট কিনেছে। মার কাছে টাকা নেই আমি জানি, গত শনিবার দুটো পয়সা চেয়েছিলাম, তাও মা দেয়নি।

মা কিন্তু ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটুলি বার করলো। তার থেকে একটা দশ টাকার নোট তুলে দিলো পরমানন্দ কাকার হাতে। আরও একটা দুটো নোট রয়েছে সেই পুঁটুলিতে।

দিদিও অবাক হয়ে তাকিয়েছে মায়ের দিকে। তারপর দিদি কী যেন বুঝলো, কিন্তু আমি বুঝলাম না।

এদিকে অনেকগুলো নৌকো দাঁড়িয়ে আছে বলে আমাদের নৌকো ঘাটে ভিড়তে পারলো না। পরমানন্দ কাকা আমাদের নৌকো থেকে অন্য নৌকোয় পা দিয়ে দিয়ে চলে গেলেন টিকিট ঘরের কাছে।

ফিরে এসে বললেন, বাপরে বাপ! পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ। কী যেন হয়েছে একটা বড়ো কাণ্ড। ইংরেজের রাজত্বে এই গঞ্জে এসে ডাকাতি করে, এদের বুদ্ধিও বলিহারি।

আমাদের নৌকোর মাঝি বললো, কী করবে কর্তা, মানুষজন যে কিছুই খেতে পায় না। ভাত ছাড়া শুধু আলু খেয়ে কি মানুষ বাঁচে?

পরমানন্দ কাকা কিছু খুচরো টাকা পয়সা ফেরত দিলেন মাকে।

তারপর বলেন, ইস্টিমার আজ লেটে ছাড়বে, শুনে আসলাম। তবু চল আমরা উঠে গিয়ে বসি। ভালো জায়গা নিতে হবে।

আমি বললাম, ও পরমানন্দ কাকা, এখন দেরি আছে, আমি একটু ঐদিকটায় গিয়ে ডাকাতদের দেখে আসবো?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললো, না! মনি, কোথাও যাবি না!

পরমানন্দ কাকা হেসে বললেন, আমি আবার কবে তোর কাকা হইলাম রে? অ্যাঁ?

পরমানন্দ কাকা আসলে আমার মায়ের কাকা। তা হলে আমার কী হয়? দাদু না ঠাকুর্দা কী যেন। অতো আর বলতে ইচ্ছে করে না।

লেট মানে কী, স্টিমার ছাড়বে সেই বিকেলে। এখনো পাঁচ ঘণ্টা বাকী। অন্য যাত্রীরা অনেকেই বাড়ি ফিরে গেছে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে টুমিয়ে আসবে। কেউ কেউ খেতে গেছে হোটেলে। দু'চার-জন স্টিমারের খালাসিদের পয়সা দিয়ে তাদের রান্না খায়। আমরা ব্রাহ্মণ বলে আমাদের ওসব কোনো জায়গাতেই খেতে নেই। আমাদের চিড়ে-মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে।

বাবা অবশ্য এসব মানে না। বাবা একবার আমাকে নিয়ে আসার সময় এই ফতেপুরের হোটেলে ভাত-ডাল-মাছের ঝোল খাইয়ে-ছিল। অবশ্য বাবা সাবধান করে দিয়েছিল, সে কথা যেন আমি মামাবাড়িতে গিয়ে কারুকে না বলি!

ওপরের ডেক প্রায় ফাঁকা। এতো ভালো জায়গা কোনোদিন পাই নি। পাঁচ ঘণ্টা পরে ছাড়লেও ক্ষতি নেই। আরও বেশিক্ষণ স্টিমারে থাকতে পারবো।

এখান থেকে দূরের ভিড়টা দেখা যায়। পুলিশের লাল পাগড়ি আর লাঠি বেশ বোঝা যাচ্ছে। লোকদের গোলমাল ক্রমশ বাড়ছে আর শোনা যাচ্ছে পুলিশের হুইস্‌ল।

এক সময় সেই ভিড়ের কাছ থেকে একটা নৌকো বেরিয়ে এলো। আমাদের স্টিমার থেকে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ যে, ঐ যে ডাকাত।

একটা বড়ো নৌকোর মধ্যে সাত আটজন পুলিশ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে দাঁড়ানো তু'জন মানুষ। সেদিকে তাকিয়ে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো। এরা তো ডাকাত নয়, জীবনলাল আর তার এক বন্ধু! এই বন্ধুটিও সেই রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

দিদি রেলিং ধরে ঝুঁকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেই মা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে হিস হিস করে বললো, চুপ কর! চুপ কর হারামজাদি! টুঁ শব্দ করবি না!

দেখলেই বোঝা যায় জীবনলাল আর তার বন্ধু প্রচণ্ড মার খেয়েছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ঠোঁটের পাশে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও, জামা প্যাণ্ট কাদায় মাখামাখি। হাতে হাতকড়া বাঁধা।

নৌকোটা আমাদের স্টিমারটার খুব কাছ দিয়েই গেল। জীবনলাল তাকাচ্ছে না এদিকে। আমার খুব ইচ্ছে করছে ওর নাম ধরে এক-বার ডেকে উঠতে। কিন্তু তাতে যদি আমাদেরও পুলিশে ধরে? তা হলে আর বাবার কাছে কলকাতায় যাওয়া হবে না।

জীবনলাল একবার এদিকে মুখ ফেরাতেই আমি একটু হাত নেড়ে দিলাম।

জীবনলাল দেখতে পেয়েছে! দেখতে পেয়েছে! আমাকে, দিদিকে, মাকে ভালো করে দেখলো। চিনতে পারলো কি না বোঝা গেল না।

অত মার খেয়েছে, তবু কী তেজীর মতন দাঁড়াবার ভঙ্গি। একটুও নুয়ে পড়েনি। মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন নেই।

বন্দী যুবরাজ!

৭

মনে আছে, আগেরবার যখন বাবার সঙ্গে ফিরেছি, তখন খুলনায় স্টিমার থেকে নেমেই হুড়োহুড়ি করে গিয়ে আমাদের ট্রেনে উঠতে হয়েছিল। মাঝখানে বেশি সময় ছিল না। এবারে আমাদের স্টিমার এসেছে সাড়ে ছ'ঘণ্টা দেরি করে, কলকাতার ট্রেন চলে গেছে কবে! পরের ট্রেন আবার কাল রাত্তিরে।

বাবাকে আগেই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, শিয়ালদা স্টেশনে বাবা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের না পেয়ে ফিরে যাবে।

পরমানন্দ কাকা বললেন, সুধা, তোরা চল, শান্তির শ্বশুরবাড়ি কয়েকদিন থাকবি। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।

মা বললো, না কাকা, আমরা বরং রেলের স্টেশনে গিয়ে বসে থাকি। কালকের ট্রেনে যাবো।

পরমানন্দ কাকা বললেন, ধুৎ, তা কখনো হয় নাকি! তোদের রেলের ইস্টিশানে ফেলে আমরা চলে যাবো? তা ছাড়া, সন্তোষকে আবার খবর দিতে হবে না?

মা বললো, আজকের রেলে ও আমাদের না দেখলে কালকের রেলও দেখতে আসবে।

পরমানন্দ কাকা বললেন, যদি না আসে? সে বুঝবে কী করে? অমন হারা উদ্দেশ্যে কি কলকাতার মতন শহরে যাওয়া যায়? কতো রকম ঠগ্-জোচ্চোর সেখানে গিস্‌গিস্ করে। তোরা চল আমাদের সাথে।

শান্তি মাসিও খুব পেড়াপিড়ি করতে লাগলো। মাও কিছুতেই রাজি নয়। শান্তি মাসির শাশুড়ির অসুখ, সেই বাড়িতে কি কেউ অতিথি নিয়ে যায়!

শান্তি মাসি তখন গোঁ ধরে বললো, তোরা না গেলে আমিও আজ যাবো না। রেলের ইষ্টিশানে তোদের সাথে বসে থাকবো!

শান্তি মাসির শরীর খারাপ, তাকে এখন ঐভাবে রাখা চলে না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত মাকে মেনে নিতেই হলো।

শান্তি মাসিদের শ্বশুরবাড়ি বাগেরহাট। সেখানে তাদের মস্ত বড়ো বাড়ি, দোতলা দালান, তিনখানা পুকুর, পাশাপাশি দু'খানা শিব-ঠাকুর ও মা কালীর মন্দির আর প্রচুর সুপারিগাছ। সে বাড়িতে এতো মানুষ যে আমরা তার মধ্যে মিশে গেলাম, বিশেষ কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করলো না।

দু'দিন বাদে আমাদের অন্য রকম একটা সুযোগ ঘটে গেল।

শান্তি মাসির এক খুড়তুতো দেওরের নাম জীমূতবাহন। অদ্ভুত নাম, শুনলেই হাসি পায়। তবে, জীমূতবাহন নিজের নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দেয়, জীমূত মানে মেঘ, আর জীমূতবাহন হলো ইন্দ্র। সেইজন্যই আমার ডাক নাম ইন্দু।

পরে অবশ্য আমি জেনেছিলাম, ইন্দ্র আর ইন্দু মোটেই এক নয়। ইন্দু মানে চাঁদ। ইন্দু নামটাও তো খারাপ নয়, শুধু শুধু তার ঐ রকম একটা খটোমটো ভালো নাম রাখার কী দরকার ছিল?

এই ইন্দু কলকাতার সিটি কলেজে বি এ পড়ে। সেই জন্যই গ্রামে তার খুব খাতির। ইংরিজি সিনেমার ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের মতন তার সরু গোঁফ আর মাথার চুল অ্যালবার্ট কাটা। চোখে সোনালি চশমা। হাতে সব সময় একটা মোটা বই থাকে।

ইন্দু পরের দিনই কলকাতায় ফিরবে। সবাই ঠিকঠাক করে দিলো ইন্দুই আমাদের পৌছে দিতে পারবে কলকাতায়। ইন্দুও সাগ্রহে

রাজি।

ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না। মা আর দিদিকে খুলনা থেকে ট্রেনে দেখাশুনোর ভার নেবার কথা আমার, মাঝখানে কোথা থেকে একটা অন্য লোক জুটে গেল। সেইদিন থেকে বড়-দের দলে আমার স্থান পাবার কথা। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় আমার আপত্তিতে কেউ কর্ণপাত করবে না।

বাগেরহাট থেকে ফিরে আমরা খুলনা থেকে চেপে বসলাম ট্রেনে। কামরাগুলো প্রায় ফাঁকা। জাপানী বোমার ভয়ে এখনো অনেকেই কলকাতায় যাচ্ছে না। যদিও ইন্দুদা আমাদের বললো, কলকাতায় এখন সেরকম কোনো ভয়ই নেই। জাপানীরা যুদ্ধে ক্রমাগত মার খেয়ে পিছু হটছে। কলকাতার দিকে তারা আর আসবে না। কলকাতায় এখন লোকজন কম, তাই বেশ মজা, জিনিসপত্র শস্তা। বাইস্কোপওয়ালারা রাস্তার লোকদের ডেকে ডেকে টিকিট দেয়। কোনো একটা বাইস্কোপ হল বিজ্ঞাপন দিয়েছে, টিকিট কিনলেই একখানা করে চিরুনি দেবে বিনা পয়সায়। হোটেলগুলো ছ'পয়সায় পেট-চুক্তি খাবার দিচ্ছে।

ইন্দুদা বেশ চটপটে আর কাজের। নিজের পয়সায় আমাদের ডাব কিনে খাওয়ালো। মা আর দিদির জন্য বেঞ্চের ওপর সুজনি পেতে বিছানা করে দিল। মাঝে মাঝে সে গুনগুন করে গান গায়।

দিদি ক'দিন ধরে একেবারে চুপচাপ হয়ে আছে। কিন্তু ইন্দুদা তাকে কথা না বলিয়ে ছাড়বে না। কতরকম গল্প সে জানে। একবার সে মাকে বললো, ও বৌদি। কলকাতায় আমার এক পিসতুতো বোনেরও নাম ছিল রানী। সে টাইফয়েডে মারা গেছে। আপনার মেয়েকে দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন সেই রানীই ফিরে এসেছে। কিন্তু আপনার মেয়ে এতো গোমড়ামুখো কেন?

আমি লক্ষ করলাম, মা আর দিদির সঙ্গে ইন্দুদার অনেক গল্প আছে

বটে, কিন্তু আমাকে সে পাত্তাই দিচ্ছে না। আমি যেন একটা এলেবেলে। আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম সারাপথ।

শিয়ালদা স্টেশানে বাবাকে কিছুক্ষণ খুঁজেও কোনো লাভ হলো না। আমাদের যেদিন আসবার কথা ছিল, তারপর চারদিন কেটে গেছে। মা তবু যেন আশা করেছিল, বাবাকে দেখতে পাবে।

মার কাছ থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটা নিয়ে ইন্দুদা বললো, এ তো দেখছি আহিরীটোলার কাছে। কোনো সমস্যা নেই, আমি আপনাদের ঠিক জায়গায় গস্ত করে দিয়ে আসবো।

ইন্দুদা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ফেললো।

কলকাতা তো আমাদের চেনা জায়গা। ট্রামের ঠনঠন আওয়াজ, ফেরিওয়ালার ডাক। এক একজন ফেরিওয়ালার গান মনে গেঁথে যায়। যেমন আমাদের পাড়ার এক চানাচুরওয়ালা, তার গানটা এইরকম: 'আমাদের এই হরিদাসের কুড়মুড় কুড়মুড় মুড়মুড় ভাজা!' এই গানটা আমি গাইতে গেলেই পাড়ার ছেলেরা হাসতো আর আমার মাথায় চাঁটি লাগাতো। আমি নাকি ড-য়ে শূন্য ড় উচ্চারণ করতেই পারি না। বাঙালরা নাকি চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারে না, চাঁদকে বলে চাদ, ফাঁদকে বলে ফাদ। আমি একদিন বলেছিলাম, আমরা ভাই সূর্যবংশের লোক, তাই চন্দ্রের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

আগে আমাদের বাড়ি ছিল বাগবাজারে। একটা সরু গলির মধ্যে। পাড়ার সব লোকের সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মুজফ্‌ফরপুর চলে গিয়েছিল বাবা। এখন আহিরীটোলা পাড়াটা কেমন কে জানে!

পথে একবার ঘোড়া-গাড়ি থামিয়ে ইন্দুদা এক দোকান থেকে জিলিপি আর কচুরি কিনে নিয়ে এলো। সত্যি খুব খিদে পেয়ে-

ছিল। কচুরিটার সঙ্গে যে তরকারি, তাতে কলকাতার গন্ধ। গ্রামে আমরা কত আলু খেয়েছি। কিন্তু এরকম আলুর তরকারি কেউ গ্রামে কখনো খায়নি। এরকম বড়ো বড়ো জিলিপিও গ্রামে পাওয়া যায় না।

মা ট্রেনেও কিছু খায়নি, এখনো খেতে চাইলো না কিছুই।

আহিরীটোলায় পৌঁছে ঠিকানা খুঁজতে হলো না বেশি। পার্কের পাশেই একটা স্কুলবাড়ি, তার পাশে একটা বাড়ির সঙ্গে ঠিকানাটা ঠিক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা একটা স্কুলবাড়ি।

মা বললো, নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। স্কুলবাড়িতে আবার কেউ থাকে নাকি?

আমারও মনে হলো, এটা তো আমার বাবার বাড়ি নয়। এ কোথায় এলাম?

বাবা কলকাতায় এসে কোনো চাকরি পেয়েছে কি না চিঠিতে তা কিছু লেখেনি। স্কুলে মাস্টারি পেলেও তার নিজস্ব একটা বাড়িঘর তো থাকবে?

একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান খৈনি খাচ্ছে লোহার গেটের পাশে একটা খাটিয়ার ওপর বসে। সে কৌতূহলী চোখে দেখছে আমাদের।

ইন্দুদা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই ইস্কুলের সন্তোষবাবু বলে একজন মাস্টারমশাই আছেন?

দারোয়ানটি বললো, ইস্কুল তো ছুট্টি হায়। এক বরষ ছুট্টি হায়। কোই ভি মাস্টারবাবু এখন আসে না।

যুদ্ধের জন্য কলকাতার অনেক স্কুল বন্ধ। ছাত্র নেই, মাস্টার নেই। শুধু দারোয়ান বাড়িটা পাহারা দেয়।

নির্ঘাত ঠিকানা ভুল হয়েছে। তা হলে কী হবে? এই বিশাল কলকাতা শহরে আমরা কী করে বাবাকে খুঁজে পাবো? সমস্ত শহরটাই এখন শূন্য মনে হচ্ছে।

ইন্দুদা বললো, মুস্কিল হয়ে গেল তো? আমি হস্টেলে থাকি, সেখানেও তো আপনাদের নিয়ে যাবার উপায় নেই। বরানগরে আমার এক কাকার বাড়ি আছে, সেখানে আপনারা দু'একটা দিন—

মা কোনো উত্তর দিলো না। পাথরের মতন মুখ করে তাকিয়ে রইলো রাস্তার দিকে।

ইন্দুদা আবার জিজ্ঞেস করলো, কলকাতায় আপনাদের চেনাশুনো আর কেউ নেই?

দিদি বললো, মা, বাগবাজারে আমরা আগে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, সে বাড়ির বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে তো আমাদের ভাব ছিল। দোতলার সবিতা মাসি আমাকে শেলাই শেখাতেন। আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারি না?

মা আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়লো।

দারোয়ানটি কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, বাবুর উমর কত: মোটা আর নাটা চেহারা? দাড়ি আছে?

ইন্দুদা আমার বাবাকে চেনে না। সে আমার বাবার বর্ণনা দিতে পারলো না। আমি বললাম, না, আমার বাবা মোটা নয়, ছিপছিপে সরু গোঁপ, কিন্তু দাড়ি নেই।

দারোয়ানটি জানালো যে ইস্কুল বন্ধ বলেই কয়েকজন বাইরের বাবু এখানে রাত্তিরবেলা এসে থাকে। ভোরবেলা স্নান করে বেরিয়ে যায় আবার সন্ধের সময় আসে। যে-সব বাবুদের ফ্যামিলি এখানে নেই, তারা বাসা ভাড়া করার বদলে এই ভাবে রাত কাটায়।

সেই আট-দশজন বাবুর নাম দারোয়ানটি বলতে পারে না। কেউ কেউ এক মাস, দু'মাস থেকে চলে যায়। দারোয়ান প্রত্যেকের কাছ থেকে দৈনিক ছ'পয়সা কিংবা মাসিক তিন টাকা হিসেবে নেয়।

ইন্দুদা দারোয়ানের কাছ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এসব খবর বার

করলো।

কিছু কিছু ঐসব বাবুদের নামে চিঠিও আসে এই ঠিকানায়। সে রকম ক'খানা চিঠি জমে আছে। দারোয়ান চিঠিগুলো এনে আমাদের দেখালো।

তার মধ্যে রয়েছে পরমানন্দ কাকার টেলিগ্রামটা। সেটা খোলাই হয়নি। আমাদের কলকাতায় আসার খবরই জানে না বাবা।

দারোয়ান বললো, হাঁ হাঁ, এই বাবু থাকে ইখানে। লেকিন পাঁচ-সাত দিন আসেনি। বর্ধমান গেসেন নোকরি ঢুঁড়তে। বাবু ফিরে আসবে। জরুর ফিরে আসবে। বাবুর কাপড়া আউর সামান এখানে আছে।

আমি দৌড়ে একটা ঘরে ঢুকে শনাক্ত করে এলাম যে গোলাপ ফুল আঁকা ট্রাঙ্কটা আমার বাবার ছাড়া আর কারুর হতে পরে না। দড়িতে টাঙানো বাবার একটা চেনা শার্ট আর একটা ল্যাঙ্গোট ঝুলছে।

দারোয়ানটি বেশ সহৃদয়। তবু সে জানালো যে, এখানে ফেমিলি নিয়ে কেউ থাকে না। সব পুরুষ মানুষ। জেনানারা থাকলে পাড়ার লোক জানবেই। তাতে তার চাকরি যাবে।

মা ঘোড়াগাড়ি থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, সেই বাবু বর্ধমান থেকে কবে আসবে ?

দারোয়ান মাথা নেড়ে জানালো, তা সে জানে না। তবে বাবু নিশ্চয়ই আসবে।

বাবার সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন এ-জায়গা ছেড়ে আমরা চলে যাই কী করে ? আর যাবোই বা কোথায় ?

ইন্দুদা দারোয়ানকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। অনেক করে কী যেন বোঝাতে লাগলো। খানিকবাদে হাসি মুখে ফিরে এলো একটা সমাধান নিয়ে।

এই ইস্কুলের দু'জন দারোয়ান, তার মধ্যে একজন দেশে চলে গেছে। সেই দারোয়ানের ঘরটি খালি পড়ে আছে। উপস্থিত দারোয়ান ইস্কুল বাড়ির মধ্যে মেয়েদের থাকতে দিতে নীতিগতভাবে রাজি নয়। কিন্তু অন্য দারোয়ানের ঘরটি ছেড়ে দিতে তার খুব একটা আপত্তি নেই।

সদলবলে আমরা সেই টালির চালের ঘরটির দরজা খুলে উঁকি মারলাম।

ভেতরে একটা খাটিয়া পাতা আছে। একটা নোংরা, শতচ্ছিন্ন মশারি, তাতে অনেক তাপ্পি মারা। আর কিছু হাঁড়ি-পাতিল এবং টিনের গেলাস।

ইন্দুদা নাক কুঁচকে বললো, এঃ বৌদি, এর মধ্যে আপনারা থাকবেন কী করে? না, না, তা হয় না!

মা চুপ করে রইলো।

ইন্দুদা বললো, চলুন, আপনাদের আমি বরানগরে আমার কাকার বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি রোজ এসে খোঁজ নিয়ে যাবো। সন্তোষবাবু এলেই আপনারা জানতে পারবেন।

মা দরজার একটা পাশ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দুদা আমাকে বললো, মনি, তুমি গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। ঘোড়ার গাড়িওয়ালাটা আবার না পালায়।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে ফিরলো। তারপর বললো, মনি, আমাদের মালপত্তরগুলো নামিয়ে দিতে বল। আমরা এখানেই থাকবো।

তারপর ইন্দুদার হাত ধরে বললো, তুমি যে কী উপকার করলে, ইন্দু! তোমায় কত কষ্ট দিলাম। তুমি না থাকলে আমরা আরও ঘোর বিপদে পড়তাম।

ইন্দুদা আরও দু'তিনবার আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারে একটু

আপত্তি জানালো বটে, কিন্তু তা টিকলো না। মা একবার কোনো ব্যাপারে না বললে তাকে আর হ্যাঁ করানো খুব শক্ত।

আমি দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে দিয়ে আমাদের বাক্স বিছানা নামিয়ে ফেলতে লাগলাম। মায়ের সিদ্ধান্তটা আমারও বেশ পছন্দ হয়েছে। ইন্দুদাকেই আমরা নতুন চিনি। তার কাকা-দের একেবারেই চিনি না। সেখানে আমরা থাকতে যাবো কেন?

কাল সকালেই আবার খোঁজ নিতে আসবে বলে ইন্দুদা বিদায় নিল শেষ পর্যন্ত।

আমরা তিনজনে তক্ষুনি ঘরখানা সাফ করতে লেগে গেলাম। খাটিয়াটা দেখলেই মনে হয়, ওতে অজস্র ছারপোকা আছে। মশারি-সুদ্ধ সেটাকে বার করে দেওয়া হলো জলের কলের কাছে ঢাকা জায়গাটায়।

আমাদের বেডিং খুলে মেঝেতে পাতা হলো বিছানা। ঘরের দেয়ালে ঝুল জমেছিল, দিদি ঝাঁটা দিয়ে সেগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার করে ফেললো। আমি মারলাম অনেকগুলো আরশোলা। আরশোলা উড়তে শুরু করলে দিদি আর মা দু'জনেই লাফাবে। আরশোলার সঙ্গে শুধু মেয়েদেরই কেন ভয়ের সম্পর্ক, পুরুষদের নয়, তা আমি আজও বুঝি না।

দারোয়ানটির নাম শ্যামলাল চৌবে। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা ও মস্ত বড়ো পাকানো গোঁফ হলেও লোকটির ব্যবহার নরম-সরম। আমরা রাত্তিরে কী খাবো, তা নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমাদের কাছে চাল-ডাল কিছু নেই, রান্না হবে কী করে? সন্ধের পর থেকেই ব্ল্যাক আউট, রাস্তাঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোনো দোকান খোলা থাকে না। কচুরি-ডালপুরি-মিষ্টির দোকানও বন্ধ।

শ্যামলাল তখন প্রস্তাব দিলো যে নিজের জন্য সে তো রুটি পাকাবেই। সে আমাদের জন্যও কিছু রুটি বানিয়ে দিতে পারে। তাতে তার

কোনো অসুবিধে নেই।

তাতেই আমরা মহানন্দে রাজি। তবু তো কিছু খাওয়া জুটবে রাত্তিরবেলা। কিছু না খেলে কি ঘুম আসে?

মা বললো, এই দারোয়ান খুব উঁচু ব্রাহ্মণ। চৌবে মানে কি জানিস, চতুর্বেদী। ওর পূর্বপুরুষরা চারখানা বেদ পাঠ করতো। এখন অবস্থার ফেরে দারোয়ানের চাকরি করে।

তারপর মা আমার মাথায় হাত রেখে বললো, মনি, যদি মন দিয়ে লেখাপড়া না করিস, তা হলে তোকেও হয়তো একদিন চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ করতে হবে!

দিদি কম কথা বলে, তবু সে হঠাৎ আমার দিক টেনে বললো, লেখাপড়া শিখেই বা কী লাভ? বাবা তো এতো লেখাপড়া জানে, তবু বাবার চাকরি নেই কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কী যে অলক্ষুনে যুদ্ধ শুরু হলো। কবে থামবে কে জানে!

ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো থাকলেও জ্বালবার উপায় নেই। সন্ধের পর আলো জ্বাললেই নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। জাপানীরা বোমা ফেলতে এলে আলো দেখলেই কলকাতা শহরটা চিনে ফেলবে।

দারোয়ান আমাদের একটা মোমবাতি দিয়েছে। সে আলোতেই আমরা গরম গরম রুটি আর ডাল খেয়ে নিলাম। দারোয়ান খুব ভালো রাঁধে। ডালটা কী চমৎকার। মা রুটি খেতে পারে না, মোটে একখানা নিলো। খেতে খেতে মা অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে।

খানিক বাদে দারোয়ান এসে বললো, মাইজী, আপলোক দরবাজা বন্ধ করকে শো যাইয়ে। কিছু ডর নেই। হামি পাহারা দেবো।

দিদি বললো, দারোয়ানটার কী রকম ডাকাতের মতন চেহারা।

মা রেগে গিয়ে বললো, ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। লোকটা কতো ভালো। ও যদি পাজি হতো, তা হলে এতক্ষণ আমরা কী করতাম বল তো ?

মোমবাতি নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। মাঝখানে মা। কারুরই ঘুম আসছে না। তিনজনের মাথাতেই একটা চিন্তা ঘুরছে।

দিদিই সেটা বলে ফেললো। দিদি আপন মনে উচ্চারণ করলো, বাবা কবে আসবে ? যদি অনেকদিন না আসে ?

মা বললো, নিজের জিনিসপত্তর রেখে গেছে যখন তখন আসবে নিশ্চয়ই।

দিদি আবার বললো, মনি, তুই ট্রাঙ্কটা খুলে দেখেছিস ? তার মধ্যে কি অনেক জিনিস আছে ?

আমি বললাম, তালা বন্ধ।

মা দিদিকে বললো, তোকে অতো চিন্তা করতে হবে না।

দিদি একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার কাতর গলায় বললো, আমার কিছু ভালো লাগছে না ! মা, আমার ভয় করছে !

মা দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, অমন করে না, রানী ! এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। মানুষ এর থেকেও কতো বিপদে পড়ে। আমরা তবু তো একটা থাকার জায়গা পেয়েছি। ইন্দু খোঁজখবর নিতে আসবে। একেবারে জলে তো পড়িনি। ছাখ তো, মনি তোর চেয়ে ছোট হলেও কতো শক্ত আছে।

আমার কিন্তু মোটেই একটুও খারাপ লাগছে না। সবই যেন অ্যাডভেঞ্চার। এই ক'দিনে কতো কীই না ঘটে গেল। মামাবাড়ি ছেড়ে স্টিমারে এক রাত। তারপর শান্তিমাসির শ্বশুরবাড়ি, একেবারে অচেনা জায়গায় ছ'রাত, তারপর ট্রেনে, আজ এক দারোয়ানের ঘরে। শুয়ে শুয়েও মনে হচ্ছে, এখনো যেন চলেছি। এরপর আর কোথায় যেতে হবে কে জানে !

ট্রেনের দুলুনির অনুভূতিটা যায়নি, বিছানাটা যেন দুলছে। রাস্তায় মাঝে মাঝে বুটজুতোর শব্দ শোনা যায়। আর হুইস্‌ল। এই অন্ধকারেও ঘুরছে পুলিশ। কোথায়, কতদূরে একটা যুদ্ধ চলছে। বোমা, বন্দুক, কামান। প্লেনে করে জাপানীরা যখন তখন উড়ে আসতে পারে কলকাতায় বোমা ফেলার জন্য। জাপানীরা যুদ্ধ করছে ব্রিটিশের সঙ্গে, তবু আমাদের মারতে চায় কেন ?

এখন যদি এই স্কুলবাড়িটার ওপর একটা বোমা পড়ে, তা হলে বাবা আর কোনোদিন আমাদের খুঁজে পাবে না।

চোখে ভাসছে স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখা সেই দৃশ্যটা। পুলিশ-ঘেরা বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জীবনলাল, হাতে হাতকড়া বাঁধা, মাথায় ব্যাণ্ডেজ, ঠোঁট থ্যাঁতলানো।

দিদি হঠাৎ হেঁচকি দিয়ে কেঁদে উঠলো।

মা বললো, চুপ চুপ, অমন করে না। এখন বড়ো হয়েছিস, রানী, এতো অবুঝ হলে কি চলে ?

বিপ্লবী জীবনলালকে পুলিশ ধরেছে ডাকাত বলে। সত্যি কি ডাকাতি করতে গিয়েছিল ? এরপর থানায় নিয়ে গিয়ে আরও মারবে, মারতে মারতে কি মেরে ফেলতে পারে ? থানার পাঁচিল ডিঙিয়ে জীবনলাল পালাতে পারবে না ? জীবনলালের আরও বন্ধুরা যদি তাকে উদ্ধার করার জন্য বন্দুক নিয়ে এসে থানা অ্যাটাক করে ?

ইস, আমি কেন আর একটু বড়ো হলাম না ? যদি আর পাঁচ-ছ'-বছরও বয়েস বেশী হতো, তাহলে আমি কি এখন মায়ের পাশে শুয়ে থাকতাম ? তা হলে আমি সুভাষ বোসের কাছে চলে গিয়ে বলতাম, আমাকে আপনার দলে নিন, আমিও লড়াই করবো।

এক সময় ঘুম এসে গিয়েছিল, সবেমাত্র চোখ বুজে এসেছে, এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ হলো।

মা আমার একটা হাত চেপে ধরলো।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসতেই মা ফিসফিস করে বললো, দরজা খুলবি না।

আবার ঠক ঠক শব্দ হলো। কেউ যেন চুপি চুপি আমাদের ডাকছে।পুলিশ কিংবা মিলিটারি হলে নিশ্চয়ই দুম দুম করে ধাক্কা দিত।

তৃতীয়বার ধাক্কা দিয়ে কে যেন চাপা গলায় বললো, খোলো। দরজা খোলো!

এবার আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে?

ওপাশ থেকে বললো, মনি, শিগগির দরজা খোল!

বাবা!

আমি এক লাফে উঠে গিয়ে খুলে দিলাম দরজার খিল।

একটু বেশি রাত করে চাঁদ উঠেছে।ছড়িয়ে আছে হাল্কা জ্যোৎস্না। তাতে বাবাকে চিনতে খুব অসুবিধে হলো না। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামলাল।

বাবা তাকে বললো, ঠিক হ্যায় দারোয়ানজী, আপ শো যাইয়ে?

বাবা ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে সেখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একটা মোটে জানালা, তাও আমরা খুলে রাখিনি। আমি বললাম, দিদি, মোমবাতিটা জ্বাল।

সেই মোমের আলোয় দেখা গেল বাবা যেন একটা চোরের মতন উৎকটমুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ক'মাসে খুব রোগা হয়ে গেছে বাবা, গায়ে একটা ময়লা পাঞ্জাবি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো যেন অনেকটা ঢোকা।

প্রথম কয়েক মিনিট বাবা একটাও কথা বললো না। আমরাও চুপ। মা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। আমার মনে হলো, আমরা

গ্রাম থেকে এসে পড়েছি বলে বাবা খুব রাগ করবে।
এবার বাবা পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাই বার করে ধরালো।
এই আমার সেই শৌখিন বাবা! সব সময় কড়া ইস্ত্রি করা জামা ছাড়া কিছু পরতো না। বাবার সিগারেটের প্যাকেট দেখে মামারা বলতো, ইস, আপনি এত দামি সিগারেট খান!
আমার আর দিদির দিকে তাকালোও না বাবা। বিড়িটা ধরিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ে কাঁপা গলায় বললো, সুধা, আমার খুব বিপদ। যে কোনোদিন আমায় পুলিশে ধরবে!
মা খানিকটা উদাসীন গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেন, তুমি কী করেছো?
বাবা বললো, কিছু করিনি! কিছু না! সেই যে সেই জীবনলালের ব্যাপারটা। ওঃ, কী কুক্ষণেই যে ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল! আমারও বুদ্ধিভ্রংশ হলো, আমি ওকে নিয়ে গেলাম তোমাদের বাড়ি। সেই জ্বালায় এখনো জ্বলেপুড়ে মরছি! একটা ভুলের জন্য··· একেবারে শেষ হয়ে যাবো!
—অত দূরের গ্রামের ব্যাপার। এখানকার পুলিশ জানবে কী করে?
—তোমাদের গ্রামের সেই যে পুলিশটা। বিপুল সাহা। সে নিশ্চয়ই কলকাতায় রিপোর্ট পাঠিয়েছে। একদিন কী হলো জানো? কলেজ স্ট্রিটে একটা চায়ের দোকানে বসে আছি, একটা লোক আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। মালকোঁচা মারা ধুতির ওপর শার্ট পরা। সে বললো, দাদা, আমি আই বি'র লোক। আপনাকে চিনি। আমার বাগবাজারে বাড়ি, আপনি আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। আপনি নিরীহ মানুষ, সেইজন্যই বলছি, আপনার পেছনে স্পাই লেগেছে। টেররিস্টদের সঙ্গে নাকি আপনার যোগ আছে। সাবধানে থাকবেন। এক ঠিকানায় বেশিদিন না থাকলেই ভালো।

সেইজন্যই তো বাসা ভাড়া নিইনি। মেসে-হোটেলেও থাকি না।

—তুমি বর্ধমানে গিয়েছিলে কেন ?

—চাকরির জন্য। এখন অনেক চাকরি পাওয়া যাচ্ছে হঠাৎ। গভর্নমেণ্টের অনেক ডিপার্টমেণ্টে লোক নিচ্ছে। কলকাতার অফিস টফিসে তো কাজের লোক বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সেই আই বি ছোকরাই আমাকে বলেছিল, সরকারি চাকরি নিতে গেলেই আমি ধরা পড়বো। পুলিশ এনকোয়ারি হবেই, তাতেই সব বেরিয়ে যাবে। বর্ধমানে এক ভদ্রলোক তাঁর পেট্রোল পাম্প চালাবার জন্য একজন লোক খুঁজছে। আমার মনে হয়, বর্ধমানে কাজ নেওয়াই আমার পক্ষে তবু নিরাপদ।

—জীবনলাল ধরা পড়েছে !

খবরটা এমনই আকস্মিক ব্যাপার যে বাবা চমকে অ্যাঁ বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো মায়ের দিকে। তারপর খুবই নিরাশভাবে বললো, সে কি, ধরা পড়ে গেল শেষ পর্যন্ত ! এত লোক মিলে, এত কাণ্ড করে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো, তবু কিছুই করতে পারলো না ?

একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললো, এখন জীবনলাল যদি পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমার নাম বলে দেয়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। পুলিশ কালই আমায় জেলে ভরে দেবে।

আমি বললাম, না। জীবনলাল কারুর নাম বলবে না !

দিদি বড়ো বড়ো চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। যেন আমার গলায় নিজের কথাটাই শুনতে পেল সে।

বাবা বললো, তা বোধহয় বলবে না ! ছেলেটার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আছে। এ সব ছেলে তো আমাদের মতো নয়। অন্য ধাতুতে

গড়া। এরপর বোধহয় পুলিশ আর আমাকে খুঁজবে না। জীবন-লালকে ধরার জন্যই তো আমার পেছনে স্পাই লেগেছিল।

এতক্ষণ পর যেন আমাকে আর দিদিকে ভালো করে দেখলো বাবা। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা চলে এলে? আর থাকতে পারলে না?

মা বললো, দুটো ছেলেমেয়ে যদি আমার গলার কাঁটা হয়ে না থাকতো, তা হলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করতাম।

বাবা বললো, তোমাদের চিন্তায় সর্বক্ষণ আমি কত যে কষ্ট পেয়েছি, তা কী করে বুঝবে? এলে কী করে, তোমার কাছে তো পয়সা ছিল না! কে ধার দিলো?

মা বললো, হারুন স্যাকরাকে দুটো দুল বিক্রি করেছি।

বাবা তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, ভালোই করেছো। সোনার দাম চড়চড় করে বাড়ছে। এখন গয়না বিক্রি করলেই লাভ। যুদ্ধ থামলেই সোনার দাম আবার পড়ে যাবে, তখন এই সব গয়নাই আদ্ধেক টাকায় পাওয়া যাবে। তোমার গয়নাগাটি সব বাপের বাড়িতে রেখে আসোনি তো?

মা নিজের তলপেটে হাত দিয়ে বললো, না, সব এনেছি!

বাবা পাঞ্জাবিটা খুলতে খুলতে বললো, তোমরা এসেছো, ভালোই করেছো। একা একা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে আমার আর ভালো লাগছিল না। এবার আবার সংসার পেতে বসবো। তারপর যা হয় হোক!

৮

সকালবেলা দেখতে পেলাম ইস্কুলবাড়ির রাতের বাসিন্দাদের। যেখানে ছাত্রদের জল খাবার পর পর পাঁচখানা কল, সেখানে দাঁত মাজছে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ, লুঙ্গি পরা। খালি গা। দু তিনজনকে মনে হলো হিন্দুস্থানী। একজন জিভছোলা দিয়ে জিভ চাঁছছে অ্যা অ্যা অ্যা অ্যা শব্দ করে। একজনের হাতে লোহার বালা।

আমাকে দেখে কেউ কোনো মন্তব্য করলো না।

একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে আমি চায়ের দোকান খুঁজতে বেরোলাম। বাবা বলে দিয়েছে। সামনের পার্কের এক কোণে একজন চা বানায়। চা না খেয়ে বাবা বিছানা থেকে উঠতে পারে না। অন্যদিন দারোয়ান চা এনে দেয়।

চায়ের দোকানটা সগ্য খুলছে, কিছু মিস্তিরি-জাতীয় লোক চা খাচ্ছে সেখানে।

দু পয়সায় গেলাস ভর্তি চা দিলো। কিন্তু কাঁসার গেলাসটা এমনই তেতে গেল যে ধরাই যায় না। জামার সামনের দিকটা দিয়ে গেলাসটা জড়িয়ে নিলাম, তারপর হাঁটতে লাগলাম পা টিপে টিপে। তবু চা চলকে চলকে পড়ছে।

এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে দুবার সুড়ুত করে চুমুক দিতেই চা কমে গেল খানিকটা। এই বুদ্ধিটা হঠাৎ মাথায় এলো। চা তো পড়েই যাচ্ছিল, আমি খেয়ে নিলেও ক্ষতি নেই। বড়োদের খাওয়ার জিনিস এঁটো করতে নেই, তা জানি কিন্তু কেউ দেখতে না পেলে

এঁটোতে কোনো ক্ষতি হয় না। দোকান থেকে আমরা যা কিনি, তার কোনোটা আগে থেকে এঁটো কি না তা কে জানে?

আগে যখন আমরা বাগবাজারে থাকতাম, তখন সে পাড়ার একটা মিষ্টির দোকানে একটি নাত্নস-নুত্নস, পানতুয়া রঙের ছেলে বসতো বিক্রেতার জায়গায়। মাঝে মাঝে সে রসগোল্লার গামলায় টপ করে আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুলটা মুখে দিত। সে রসগোল্লা খেত না, শুধু রস খেত। একদিন আমি দেখে ফেলতেই সে আমার রস-গোল্লার খুরিতে অনেকখানি রস ঢেলে দিয়েছিল। সেই এক গামলা এঁটো রসগোল্লা কত বাড়ির লোক খেয়েছে।

এই প্রথম আমার চা খাওয়া। আমাদের বাড়ির নিয়ম, কলেজে পড়ার আগে চা খাওয়া খারাপ। আমার কোনোদিন কলেজে পড়া হবে কি না ঠিক নেই, তবু আমি পা বাড়াচ্ছি বড়োদের জগতে।

কাল রাতে বাবার চোখে-মুখে যে একটা ঘুচি-মুচি ভাব ছিল, সেটা অনেকটা কেটে গেছে আজ সকালে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা আর বিড়ি খেল দুটো।

মা বললো, তুমি বাজার করে আনবে? একটা তোলা উনুন পেলে আমি এখানে রান্না করে নিতে পারি।

বাবা হাসতে হাসতে বললো, তুমি কি এই দারোয়ানের ঘরেই সংসার পাতবে নাকি? তোমার বাবা অত বড়ো একজন মানী লোক, তার মেয়েকে কি আমি এই অবস্থায় রাখতে পারি?

মা জিজ্ঞেস করলো, আমরা কোথায় যাবো?

—একটা বাসাবাড়ি ঠিক করতে হবে। কলকাতায় এখন যত ইচ্ছে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। বেশ সস্তা।

—কিন্তু টাকা পাবে কোথায়?

—তোমার গয়না দু-একখানা বিক্রি করতে হবে। বললাম না, সোনার দাম এত বাড়ছে, এই সময় গয়না ঘরে জমিয়ে রাখাই

বোকামি।

—তারপর গয়নাগুলো ফুরিয়ে গেলে?

—তার মধ্যে কি চাকরি পাবো না? বর্ধমানের পেট্রোল পাম্পের কাজটা তো এক্ষুনি পেতে পারি।

—আবার অচেনা জায়গায়?

—অচেনা জায়গাই এখন ভালো। বর্ধমানে চালের দাম কম। ওই সব জায়গায় এখনও লোকে বামুন শুনলে খাতির করে। প্রণাম করে পায়ে হাত দিয়ে। জানো, এখানে এক ব্যাটা কুলাঙ্গার বামুনের ছেলে জুতোর দোকান খুলেছে। হাতিবাগানের কাছে গেলেই দেখতে পাবে। যতবার সাইনবোর্ডটা দেখি, আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

—তুমি বাস্তুর কোনো খবর জানো।

—না, তা জানি না। তবে, জীবনলাল যখন ধরা পড়েছে, তখন বাস্তুর ওপর আর টর্চার করবে না। এখন ওরা জীবনলালের ওপরেই হামলে পড়বে।

—জেলখানায় চিঠি লেখা যায় না? আমি বাস্তুকে একটা চিঠি লিখতে চাই।

—কেন আবার ওসব ঝামেলা করতে যাবে? পুলিশের লোক খাম খুলে পড়ে। তারা আবার তোমার পেছনে লেগে যাবে।

তা বলে দিদি তার ভাইকে চিঠি লিখতে পারবে না?

বাবা সে কথার উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললো, তোমার কাছে ক'টাকা আছে? দাও, বাজার করে আনি। আজ দুপুরটা তো এখানে খেতেই হবে। তারপর তোমাদের নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরুবো।

এর মধ্যেই এসে গেল ইন্দুদা। হাতে এক শালপাতার ঠোঙা ভর্তি কচুরি-হালুয়া আর এক ভাঁড় ভর্তি মিষ্টি।

বাবা তার পরিচয় শুনেই উঠে পড়ে বললো, এসো, এসো ভাই।

তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবো। তুমি এদের জন্য যা করেছো …তুমি না থাকলে এরা অথৈ জলে পড়তো! বসো, বসো! ও মনি, আর একটু চা নিয়ে আয় না!
বাবার সঙ্গে ইন্দুদার ভাব জমে গেল খুব তাড়াতাড়ি।
এরপর থেকে ইন্দুদার বুদ্ধি না নিয়ে বাবা আর মা এক পা চলে না। তিনদিন আমরা থাকলাম সেই দারোয়ানের ঘরেই, এর মধ্যে অনেকগুলো বাড়িও দেখা হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, আমাদের বর্ধমানেই যেতে হবে। পেট্রল পাম্পের চাকরিটাই নেবে বাবা, সেইজন্য আমাদের পক্ষেও বর্ধমানে থাকাই সুবিধে।
আবার পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে আমরা এলাম হাওড়া স্টেশনে। সে-দিনই দেখলাম প্রচুর মিলিটারি। লাল লাল মুখ, কারুর কারুর মাথার চুলও লাল। হাওড়া ব্রিজের কাছে কয়েকটা ট্রাক থেমে আছে, একগাদা বাচ্চা ভিখিরি হাত তুলে চেল্লামেল্লি করছে, আর সাহেব মিলিটারিরা খুচরো পয়সা আর লজেন্স ছুঁড়ে দিচ্ছে তাদের দিকে।
বাবা বিড়বিড় করে বললো, শালারা গোটা দেশটাকেই ভিখিরি বানিয়ে দিলো।
বর্ধমান শহরটা আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল।
শহরের মাঝখানে মস্ত বড় একটা গেট। বিরাট বিরাট বাড়ি। আবার একটু দূরে গেলেই ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। বনজঙ্গল, বিশাল কয়েকটা দিঘি। দূর থেকে রাজার বাড়িটা দেখলে রোমাঞ্চ হয়। মনে হয়, ওর মধ্যে রয়েছে একটা রূপকথার জগৎ। রাজাকে কখনো দেখিনি, তার একটা ছবি অনেক দোকানে টাঙানো থাকে, লম্বা গোঁফওয়ালা রাজা, মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার।
পেট্রল পাম্পের পেছনেই একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি।
সেই বাড়িটার তিনখানা ঘরের মধ্যে দুখানা ঘর নিয়ে অন্য এক-

জন ভাড়াটে থাকে, আমরা পেলাম একটা ঘর আর একটা বারান্দা। রান্নাঘর নেই, সেই বারান্দারই একটা কোণ ঘিরে মায়ের রান্নাঘর হলো।

আমাদের বাগবাজারের ভাড়াবাড়িটা অনেক বড় ছিল, বসবার ঘরটাই ছিল প্রকাণ্ড। সামনে একটা উঠোন। বাবা তখন একটা সাহেবী কম্পানিতে চাকরি করতো, তারা বাড়িভাড়া দিত। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাবার অফিসটা উঠে গেল, কারণ সেটা ছিল জার্মান কম্পানি। অত ভালো চাকরি থেকে বাবা হঠাৎ বেকার।

বাগবাজারের সেই বাড়ির তুলনায় বর্ধমানের এই বাড়িটা কিছুই না, তবু মা মানিয়ে নিল বেশ। এখানে উঠোন নেই বটে, তবে বাড়ির পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি আছে। সেখানে একটা ছাতিম-গাছের তলায় আমাদের বসবার জায়গা।

বর্ধমানে সব ইস্কুল খুলে গেছে, আমাকেও ভর্তি হতে হলো একটা স্কুলে। অনেকদিন পর আবার পড়াশুনো শুরু।

ইন্দুদা কলকাতা থেকে মাঝে মাঝেই চলে আসে এখানে। প্রত্যেক-বারই কিছু না কিছু বাজার করে আনে। মায়ের হাতে রান্না খায়। দুপুরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকে। এখানে অনেকেই ভাবে ইন্দুদা বুঝি আমার নিজের দাদা।

পেট্রল পাম্পে বাবার ডিউটি সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। এই রাস্তা দিয়ে অনেক ট্রাক যায়। মিলিটারির গাড়ি থামে। মাঝে মাঝে আমি বাবার পাশে বসে থাকি। গাড়ি দেখতে আমার ভালো লাগে। মরিস, অস্টিন, শেভ্রলে, স্টুডিবেকার এইরকম কতরকম গাড়ির নাম। এখন যে-কোনো গাড়ি দেখলেই আমি তার নাম বলে দিতে পারি।

এই পেট্রল পাম্পে রাত্তিরে দু তিন খানা গাড়ি রাখারও ব্যবস্থা আছে। সেই সব গাড়ির ড্রাইভারদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।

তারা আমাকে মাঝে মাঝে গাড়িতে চাপিয়ে একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে আসে।

মামাবাড়ির গ্রামের জীবন থেকে এখনকার জীবন একেবারে অন্য-রকম। ওখানে নৌকোয় চেপে জলে জলে ঘুরতাম, এখানে গাড়িতে করে বড়ো রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে আসি। পেট্রল পাম্পের সামনে দিয়ে যে রাস্তা, সেটা চলে গেছে দিল্লি পর্যন্ত। ইতিহাসের বইতে পড়েছি, শের শাহ এই রাস্তা বানিয়েছিল। এই রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে গেলে দিল্লি পৌঁছে যাবো ? কেমন যেন অবিশ্বাস মনে হয়।

একজন ড্রাইভারের নাম দৌলত। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, মাথার চুল কদমফুলের মতন ছাঁটা। দৌলত বাঙালী নয়, তার বাড়ি কানপুর, কিন্তু বাংলা বলে আমাদেরই মতন।

সেই দৌলত একদিন বললো, মনিবাবু, গাড়ি চালানো শিখবে ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। গাড়ি চালানো শিখলে আমিও ড্রাইভারের চাকরি পেতে পারি। তাতে তো দারুণ মজা। মাইনেও পাবো, আর ইচ্ছেমতন গাড়ি চড়ে বেড়ানোও যাবে। একদিন এই গাড়ি নিয়ে দিল্লি চলে যাবো, আরও দূরে পেশোয়ার, কান্দাহার, সমরখন্দ…।

আমি স্টিয়ারিং-এ বসতেই বাবা কাচের ঘর থেকে দেখতে পেয়ে গেল। উঠে এসে প্রচণ্ড ধমক লাগালো দৌলতকে।

তারপর আমার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, খবরদার, তুই ওই গাঁজাখোরটার সঙ্গে মিশবি না। এতো বড়ো ছেলে হয়ে তুই ওর কোলে বসেছিলি, লজ্জা করে না ?

দৌলত প্রায়ই আমাকে জড়িয়ে ধরে, আদর করে আমার গালে গাল ঠেকায়, কোলে নিয়ে বসাতে চায়। অন্য সময় আমার অস্বস্তি হয়, ছটফট করে নেমে যাই, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, গাড়ি

চালানো শিখতে গেলে ড্রাইভারের কোলে বসতেই হয়।

বাবার কাছ থেকে ওইরকম বকুনি খাবার পর থেকে দৌলত আর আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। আমার খুব ইচ্ছে ছিল দৌলতের গাড়িতে দিদিকে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবো।

বাবার মেজাজটা খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। আগে বাবা আমাকে আর দিদিকে কতো আদর করতো। এখন ভালো করে কথাই বলে না। যুদ্ধের জন্যই বাবা এতটা বদলে গেল! মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলে, তোদের বাবা একজন লেখাপড়া জানা মানুষ হয়েও সামান্য একটা পেট্রল পাম্পের ম্যানেজারি করে, কপালে এও ছিল!

ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে দিদির পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মামাবাড়ির গ্রামে মেয়েদের ইস্কুল নেই। বর্ধমানেও দিদিকে ভর্তি করা হলো না, কারণ মেয়েদের স্কুল অনেক দূরে।

দিদি ঠিক করলো বাড়িতে বসেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

ইন্দুদা বই জোগাড় করে এনে দিলো। ইন্দুদাই পড়া দেখিয়ে দেয়। ইন্দুদার উৎসাহেই দিদি পড়াশুনো করতে লাগলো খুব মন দিয়ে। দিদির চেহারাটা খুব রোগা আর শুকনো হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার আস্তে আস্তে তার স্বাস্থ্য ফিরেছে। হঠাৎ দিদিকে আগের চেয়েও বড়ো দেখায়।

আমার ধারণা হলো, ইন্দুদা আর দিদির মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হয়েছে। ইন্দুদা প্রায়ই গাঢ় চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই দিদির পিঠে হাত রাখে কিংবা হাত ধরে। এই রকমই তো হয়। কে জানে, ইন্দুদা এর মধ্যে দিদিকে চুমো খেয়েছে কিনা! ড্রাইভার দৌলত আমাকে একটা বই দেখিয়েছিল, তার মধ্যে ছেলে আর মেয়েদের কতো রকম চুমো খাবার ছবি! সেই ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ছিল তসলিমার

মুখখানা। মনে পড়লেই আমার বুকটা কাঁপে।

মা প্রথমে চিঠি দিয়েছিল, তারপর থেকে মামাবাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠি আসে। বড়োমামা লিখেছে যে বাসুমামার খবর পাওয়া গেছে। বাসুমামা এখন আছে ভাগলপুর জেলে। মোটামুটি ভালোই আছে, চিঠি লিখেছে নিজের হাতে।

তসলিমাও একখানা চিঠি লিখেছে দিদিকে। বিয়ে হয়ে গেছে তার, সে শিগগিরই কুষ্টিয়া চলে যাবে তার শ্বশুরবাড়িতে। তসলিমার চিঠিতে আমার কথা কোথাও নেই। শুধু লিখেছে নিজের কথা। তার বর জাহাজে কাজ করে।

আমাদের বাড়ি থেকে বর্ধমান রেল স্টেশন বেশ দূরে। তবু ইন্দুদা আমাকে আর দিদিকে স্টেশনে নিয়ে যায়। একটা রিকশায় তিন-জনে যাই চেপে-চুপে। রেল স্টেশনের ঝমঝম শব্দ শুনলেই আমার রোমাঞ্চ হয়। উল্টোদিক থেকে আসা ট্রেনগুলোর জানলায় যে সব লোকগুলো ক্লান্ত মুখে বসে থাকে, তাদের গায়ে যেন লেগে আছে দূরের গন্ধ।

ইন্দুদাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমরা ফিরে আসি। আমাদের ফেরার রিকশা ভাড়াও ইন্দুদা দিয়ে দেয়।

একদিন ইন্দুদা আমায় বললো, মনি, তুই একা একা ফিরে যেতে পারবি না? আমি তা হলে রানীকে নিয়ে চন্দননগরে বেড়িয়ে আসতে পারি। ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে।

ইন্দুদা আমাকে নেবে না। দিদিকে একলা বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি একলা যেতে পারবো।

দিদি জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায় যাবো?

ইন্দুদা বললো, চন্দননগর, খুব সুন্দর জায়গা।

দিদি তবু খানিকটা অবাক হয়ে বললো, কেন, চন্দননগরে যাবো

কেন ?

ইন্দুদা বললো, তোমার বেড়াতে ইচ্ছে করে না ? দিনের পর দিন ঘরে বসে থাকো। চলো, চলো, সন্ধের মধ্যে ফিরে আসবো।

দিদি বললো, মাকে কিছু বলিনি। এমনি এমনি চলে যাবো ?

ইন্দুদা বললো, মনি গিয়ে তোমার মাকে বলে দেবে। আমার সঙ্গে গেছো শুনলে সুধাবৌদি কিছু বলবে না !

দিদির পিঠে হাত রেখে ইন্দুদা বললো, চলো, চলো।

দিদি একটু সরে গিয়ে বললো, না, আমি যাবো না !

ইন্দুদা তবু দিদির হাত ধরে টেনে বললো, চলো না। কিচ্ছু হবে না। ভালো লাগবে। আমার বন্ধুকে বলে রেখেছি।

দিদি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোর দিয়ে বললো, আজ যাবো না। অন্য একদিন।

দিদি লাজুক আর শান্ত ধরনের হলেও তার যে এমন দৃঢ়তা আছে তা সহজে বোঝা যায় না। দিদি কিছুতেই রাজি হলো না।

বেশ খানিকক্ষণ পেড়াপেড়ি করবার পর ইন্দুদা বিরক্ত হয়ে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে গেল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

রাগের মাথায় ইন্দুদা আমাদের ফেরার রিকশা ভাড়া দিতে ভুলে গেল।

আমার কাছে কিংবা দিদির কাছে একটা পয়সাও নেই। কিন্তু রাস্তা আমার চেনা।

মেঘলা মেঘলা বিকেল। দিদি আর আমি হাঁটছি পাশাপাশি। বড়ো বড়ো ট্রাক ভর্তি মিলিটারি যাচ্ছে। এখানে আমরা খুব প্লেন ওড়ার শব্দও শুনতে পাই। কিন্তু যুদ্ধ দেখা যায় না।

হঠাৎ দিদি বলে উঠলো, ওই লোকটাকে আমার মোটেই ভালো লাগে না !

আমি দারুণ অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুদাকে দিদি বলছে, লোকটা। যেন একজন অচেনা মানুষ। দিদির কি তা হলে ইন্দুদার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হয়নি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে?

দিদি বললো, লোকটা খুব স্বার্থপর!

এটা আরও আশ্চর্যের কথা। ইন্দুদা আমাদের কতো উপকার করেছে। সত্যিই তো প্রথমদিন কলকাতায় এসে বাবার সন্ধান না পেয়ে আমরা কোথায় যেতাম? ইন্দুদাই তো দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এখনও ইন্দুদা কলকাতা থেকে পয়সা খরচা করে আমাদের খোঁজখবর নিতে আসে। দিদির ম্যাট্রিক পড়ার জন্য কতো বই জোগাড় করে দিয়েছে।

এইরকম মানুষকে কি স্বার্থপর বলা চলে?

মায়ের তো ইন্দুদাকে ছাড়া একদিনও চলে না। বর্ধমানে সর্ষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না, ইন্দুদা কলকাতা থেকে এক টিন তেল এনে দিয়েছে। সুপুরি কাটার জাঁতিটা কোথায় হারিয়ে গেল, ইন্দুদাকে কিছু বলতেই হলো না, পরদিনই পকেটে করে একটা জাঁতি নিয়ে এলো। এইরকম আরও কতো কী!

ইন্দুদা আমাকে পাত্তা দেয় না, আমিও যে ওকে খুব একটা পছন্দ করি তা নয়। কিন্তু দিদির জন্য তো ইন্দুদা অনেক কিছু করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইন্দুদাকে সবাই ভালো বলে, তুই স্বার্থপর বলছিস কেন?

দিদি বললো, সে তুই বুঝবি না!

একটু পরে দিদি আবার বললো, ও শুধু খেতে ভালোবাসে। নিজের কথা সবসময় বলতে ভালোবাসে। সবাই ওকে প্রশংসা করবে। সেটা শুনতে চায়। দেশের জন্য কিছু করে? ওদের বয়েসী

কতো ছেলে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, জেল খাটছে, ওর সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। একদিন কী বলে জানিস? ব্রিটিশরাই নাকি ভালো। যারা ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য লড়াই করছে, তারা সব বোকা। ব্রিটিশরা চলে গেলে এ দেশটা নাকি উচ্ছন্নে যাবে! এসব কথা শুনলেই রাগে গা জ্বলে যায়!

আমি বুঝতে পারলাম, দিদি আসলে এখনো জীবনলালকেই বেশী ভালোবাসে। জীবনলালদের মতন মানুষদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে বলেই ইন্দুদার ওপর ওর এতো রাগ। দিদি কি জীবনলালকেই বিয়ে করতে চায়?

কিন্তু কোথায় জীবনলাল? সে বেঁচে আছে কিনা, তাও কেউ জানে না। পেট্রল পাম্পের ড্রাইভাররা বলাবলি করছিল, দুদিন আগে তিনজন স্বদেশীবাবুর ফাঁসি হয়েছে। ওরা তাদের নাম বলতে পারেনি। আমাদের বাড়িতে এখন কেউ আর জীবনলালের নামও উচ্চারণ করে না।

একদিন একটা পুলিশের গাড়ি পেট্রল নিতে এসেছিল। তারা বাবার খোঁজ করতে আসেনি, তবু বাবা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েছিল বাথরুমে।

দিদির জন্য আমার কষ্ট হলো। আমি দিদির হাত ছুঁয়ে বললাম, দেখিস দিদি, আমি আর একটু বড়ো হলেই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে যাবো। আমিও জেল খাটবো!

৯

সেদিনের পর ইন্দুদা আর এলো না। কেটে গেল পাঁচ দিন, ছ' দিন। এমন কক্ষনো হয় না। ইন্দুদা একদিন—দু' দিন অন্তর আসতোই।

মা চিন্তিত হয়ে দিদিকে জিজ্ঞেস করলো, ইন্দু কেন আসছে না রে? তোকে কিছু বলে গেছে?

দিদি দু' দিকে মাথা নাড়লো।

আমি তো জানি ইন্দুদা দিদির ওপর রাগ করে আসছে না। কিন্তু সে কথা বলতে যাবো কেন?

মা বললো, ছেলেটা অসুখে পড়লো নাকি? না হলে কোনো খবর দিলো না, কিছু না। ছেলেটা আমাদের জন্য এত করে, ওর একটা খবর নেওয়া উচিত না?

কিন্তু কে খবর নেবে?

বাবা বললো, হ্যাঁ, চিন্তারই কথা। কিন্তু কলকাতায় খবর নিতে কে যাবে? আমার তো একদিনও ছুটি নেই। একদিন যে চট করে গিয়ে ঘুরে আসবো, তারও কি উপায় আছে?

মা বললো, ওকে চিঠি লেখা যায় না?

বাবা বললো, সিটি কলেজের পাশের হস্টেলে থাকে, এইটুকুই তো জানি। এই ঠিকানায় কি চিঠি যায়?

ভাবনা চিন্তা করতে করতে কেটে গেল আরও তিনটে দিন। তবু ইন্দুদার কোনো পাত্তা নেই। ট্রেনের শব্দ শুনলেই মা উৎকর্ণ হয়ে

থাকে। ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকায়।

বাবা একদিন দুপুরে খেতে এসে বললো, ড্রাইভাররা বলাবলি করছে, কলকাতায় খুব কলেরা শুরু হয়েছে। হাসপাতালগুলোতে জায়গা নেই। ছেলেটার একবার খবর না নিলে বিবেকদংশন হচ্ছে।

মা বললো, না, না অমন অলুক্ষণে কথা বলো না। ইন্দুর কেন কলেরা হবে?

বাবা বললো, একটা কাজ করা যেতে পারে। আমাদের ব্রজবাবু কাল কলকাতায় যাচ্ছে। ওর শ্বশুরবাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রিটে। সিটি কলেজ সেখান থেকে দূর হবে না। ব্রজবাবুর হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবো? ব্রজবাবুকে বলবো, কলেজের ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে দিলেই হবে।

মা বললো, তুমি আজই চিঠিটা লিখে ফেলো। আমিও দুটো কথা লিখে দেবো এখন তারপরে।

তারপর মা দিদির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তুই লিখবি নাকি কিছু?

পাথরের মতন মুখ করে দিদি বললো, না।

ব্রজবাবু পেট্রল পাম্পের মালিকের ভাই। মালিক রাখালবাবু এক মাস ধরে অসুস্থ, অনেকে বলছে, উনি আর বাঁচবেন না। ব্রজবাবুই এখন সব দেখাশুনো করে। ব্রজবাবু টাকা গুনতে খুব ভালোবাসে। সন্ধেবেলা পেট্রল পাম্পে এসে এক তাড়া নোট নিয়ে চারবার, পাঁচবার গোনে। কোনোবার একখানা কম হয়। কোনোবারে বেশি।

ব্রজবাবু চিঠিখানা নিয়ে যেতে রাজি হলো। তার শ্বশুরবাড়ি থেকে সিটি কলেজ এক মিনিটের রাস্তা।

ব্রজবাবুর শ্বশুরবাড়ি যেতে পয়সা লাগে না। এই পেট্রল পাম্পে

তেল নেয় যে-সব ট্রাক, তাদের কয়েকটা মাঝে মাঝে কলকাতায় যায়। ব্রজবাবু ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ে।

দু' দিন বাদেই এসে উপস্থিত হলো ইন্দুদা। সঙ্গে একশোটা লিচু।

আগের মতনই হাসি মুখ। মায়ের প্রশ্ন শুনে বললো, কিছু না, এই একটু জ্বর হয়েছিল। কলেজে তো ক্লাস বিশেষ হয় না, তাই বরানগরে কাকার বাড়িতে চলে গেলাম।

দিদির দিকে তাকিয়ে বললো, রাণী, এই ক'দিন পড়া ফাঁকি দিয়েছো নিশ্চয়ই!

মা লিচু ছাড়িয়ে দিলো একটা প্লেটে।

ইন্দুদা বললো, আমি লিচু খাবো না। ও আপনাদের জন্য। আমার আজ খুব লুচি বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে! হস্টেলের ঠাকুর একেবারে লুচি বানাতে পারে না।

তারপর ইন্দুদা কাঁধের ঝোলা থেকে একটা ঘিয়ের টিন বার করলো। এক গাল হেসে বললো, কলকাতায় ঘি এখন কতো শস্তা, ধারণা করতে পারবেন না। খদ্দেরই নেই। মিলিটারিরা ঘি খায় না। মোটে চার টাকা সের।

লুচির কথা শুনে মায়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়িতে কতদিন ঘি আসে না। মা আমাকে একটা সিকি দিয়ে বললো, মনি, ময়দা কিনে আন তো!

আবার ইন্দুদা আসা যাওয়া শুরু করলেও ঠিক যেন আগের মতন স্বাভাবিক হলো না সব কিছু। চন্দননগরের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না কিছুতেই। মা কাছাকাছি না থাকলেই দিদি আর ইন্দুদা ঝগড়া শুরু করে।

ইন্দুদা জেদ ধরে আছে দিদিকে একদিন চন্দননগরে বেড়াতে নিয়ে যাবেই। দিদিও যাবে না কিছুতেই। ইন্দুদা মায়ের সম্মতি নিতে

রাজি আছে, তবু দিদি যাবে না।

দিদিরই বা এতো আপত্তি কেন কে জানে! দিদির চন্দননগরে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না? জায়গাটার নাম শুনেই তো আমার যেতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু ইন্দুদা আমাকে সঙ্গে নেবার কথা একবারও বলে না।

একদিন মা ইন্দুদাকে বললো, তোমার বোনের তো এবার বিয়ে দিতে হয়! বয়েসটা তো কম হলো না। ব্রজবাবু ওঁর এক শালার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চান। ছেলেটি তো তোমাদের কলেজের কাছেই থাকে। তুমি একটু খোঁজ নেবে?

ইন্দুদা জিজ্ঞেস করলো, কী করে ছেলেটি?

মা বললো, শুনেছি তো কলকাতায় এ আর পি'র কাজ করে।

ইন্দুদা ঠোঁট উল্টে বললো, এ আর পি? ফুঃ! ওটা আবার একটা কাজ নাকি? যুদ্ধ শেষ হলেই ছাঁটাই হয়ে যাবে। লেখাপড়া কদ্দূর করেছে?

মা বললো, আই এ প্লাকৃড।

ইন্দুদা হো-হো করে হেসে উঠে বললো, আই এ প্লাকৃড! তবু ম্যাট্রিক পাশ বলবে না। তার মানে ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশান! ঠিক আছে, আমি ছেলেটার সঙ্গে কথা বলবো। আপনারা যদি রানীর বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন, আমি আরও ভালো ছেলের খোঁজ করতে পারি।

মায়ের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এক গাল হেসে বললো, তোমাকেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তোমার ওপরেই তো সব ভরসা। তোমাদের জামাইবাবুকে তো দেখছোই, একদম সময় পায় না, বেরোতেই পারে না পাম্প ছেড়ে।

ইন্দুদা বললো, রানী ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে নিক না। আর তো চার-পাঁচ মাস বাকি।

মা বললো, সে ওর ইচ্ছে হলে বিয়ের পরেও পড়তে পারে।

ইন্দুদা বললো, কি রকম বাড়িতে গিয়ে পড়বে, তার ওপর নির্ভর করছে। সব বাড়িতে তো মেয়েদের লেখাপড়ার চল নেই।

মা বললো, বিয়ের কথা উঠলেই তো বিয়ে হয় না। অনেক খোঁজ-খবর তো নিতে হবেই। ওর পরীক্ষার আগে কিছু হবে কি না সন্দেহ। তবু খোঁজ খবর তো চালিয়ে যেতে হবে!

ব্রজবাবুর শালা শ্যামসুন্দর এর মধ্যে একদিন এসে উপস্থিত হলো পেট্রল পাম্পে। আমি বাড়ির পেছনের বাগানে একটা প্যাঁকাঠির মাথায় মাকড়সার জাল জড়িয়ে ফড়িং ধরছিলাম, এই সময় একজন আর্দালি এসে জানালো যে বাবা আমাকে ডাকছে।

আমি ছুটে গেলাম তক্ষুনি।

ব্রজবাবু এলে বাবা নিজে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে একটা টুলে বসে। ব্রজবাবু ড্রয়ার খুলে টাকা গুনতে শুরু করে। আমি গিয়ে দেখলাম, বাবার পাশে আর একটা টুলে বসে আছে অন্য একজন মানুষ। লম্বা, মাজা মাজা রং। গেরুয়া কলারের পাঞ্জাবি পরা। মুখ ভর্তি পান। ইন্দুদার চেয়ে বয়েসে বেশ বড়ো। মনে হয় যেন বাবা আর ইন্দুদার মাঝামাঝি বয়েসী।

আমাকে দেখে শ্যামসুন্দর বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, এই বুঝি আপনার ছেলে? বাঃ! নাম কী? কোন্ ক্লাসে পড়ো?

বাবা আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা টাকা দিয়ে চুপি চুপি বললো, তুই যা মনি, চারটে রাজভোগ আর চারখানা সন্দেশ কিনে আগে বাড়িতে দিয়ে আসবি। তার পর তুই এসে বসবি এখানে। আমি এনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো। মাকে বলিস তোর দিদিকে একখানা ভালো শাড়ি পরিয়ে দিতে!

মিষ্টির দোকানটা খানিকটা দূরে হলেও ওখান থেকে কিছু কিনতে গেলে আমার খুব আনন্দ হয়। এক টাকার মিষ্টি কিনলে দোকান-

দার আমাকে ফেরত দেয় এক আনা। ওটা হলো দস্তুরি। এই এক আনা আমার উপার্জন।

মিষ্টিগুলো মায়ের হাতে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, দিদি, মুখে একটু স্নো-পাউডার মেখে নে, তোকে দেখতে আসছে!

পাম্পে ফিরে গিয়ে আমি বাবার চেয়ারে বসলাম। বাবা ভদ্রলোক দু'জনকে নিয়ে চলে গেলেন বাড়িতে।

এখন কেউ পেট্রল কিনতে এলে আমার হাতে টাকা দেবে। আমি ক্যাশমেমো কাটতে জানি। গাড়িতে পেট্রল ঢেলে দেয় রামু, ঐ কাজটাও আমি পারি। কিন্তু রামু নলটা আমার হাতে ছাড়তে চায় না।

রামু একটা শতচ্ছিন্ন খাঁকির প্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরে থাকে। গুন-গুন করে সর্বক্ষণ কী যেন গান গায়। সেও নাকি অনেক ড্রাই-ভারের মতন খুব গাঁজা খায়। একটু ফাঁক পেলেই সে চলে যায় বাথরুমে! তার চোখ দুটো টকটকে লাল, এ ছাড়া তাকে দেখে অন্য কিছু বোঝা যায় না। একদিন আমি রামুকে একটানা দু' ঘণ্টা ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেছিলাম। একটা গাড়ির বনেটে বসে ভিজতে ভিজতে মাথা নেড়ে নেড়ে গান গাইছিল। সবাই বলেছিল, বদ্ধ গাঁজাখোর না হলে কেউ অতক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে পারে না। গাঁজা খেয়ে খেয়ে তার মাথাটা একেবারে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার, রামু বেশ ভালো ইংরিজি জানে। আমার বাবার চেয়েও অনেক ভালো ইংরিজি বলতে পারে। মিলিটারির ট্রাক এলে সে ইংরিজিতে কী যেন বলে, তা শুনে সাহেবরা খুব হাসে। রামু লেখাপড়া শেখেনি, তবু সে এমন চমৎকার ইংরিজি বলতে পারে। তার কারণ, এই যে মহাযুদ্ধ, তার আগের প্রথম মহাযুদ্ধে রামু সোলজার ছিল। সে লড়াই করেতে গিয়েছিল মেসোপটে-

মিয়াতে। সেখানে নানান জাতের লোক, তাই তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ইংরিজি শিখে গেছে।

কিন্তু রামুর কাছে যে সেই যুদ্ধের গল্প শুনবো তার উপায় নেই। সে গল্প বলতে জানে না। কথাই বলতে চায় না প্রায়। খালি গান গায় আপন মনে। অত ভালো ইংরিজি জেনেও রামু কেন অন্য চাকরি পায় না কে জানে! সংসারে নাকি রামুর আর কেউ নেই।

বাবা ফিরে এলো প্রায় এক ঘণ্টা বাদে। বাড়িতে এতক্ষণ কী যে ঘটলো, তা জানতে পারলাম না। বাড়িতে এসে দেখি, দিদি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে পরে আছে মায়ের একখানা বেনারসী। মায়ের মুখখানা গোমড়া।

ব্রজবাবু আর তার শালা এমন হ্যাংলা যে রাজভোগ আর সন্দেশ সব খেয়ে নিয়েছে!

পরদিন এলো ইন্দুদা।

মা খুব ব্যগ্রভাবে বললো, ও ইন্দু, তুমি খবর নিয়েছিলে? এদিকে পাত্র যে নিজেই দেখতে এসেছিল!

ইন্দুদা মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করলো, এসেছিল? ওদেরই খুব গরজ দেখা যাচ্ছে। তা কেমন দেখলেন? পাত্রকে আপনারা কেমন দেখলেন সেইটা আগে বলুন!

মা এই সরাসরি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললো, রানীটা এমন অসভ্য হয়েছে। প্রথমে তো কিছুতেই ওদের সামনে আসতে চায় না। তারপর যদি বা এলো, কথাই বলে না। একটা প্রশ্নের উত্তর দেয় না। আচ্ছা বলো তো, এরকম করলে ওরা মেয়েকে বোবা ভাববে না?

ইন্দুদা মজার সুরে বললো, ওরা রানীকে বোবা ভেবেছে বুঝি?

—না, তা ভাবেনি। বোবা কি বোঝা যায় না? ওদের কিন্তু

রানীকে পছন্দ হয়েছে। পাত্র নিজের মুখে তা বলেনি বটে, কিন্তু ব্রজবাবু বললেন, সামনের মাসেই ওরা কাজটা লাগিয়ে দিতে চান। রানীর কুষ্ঠি নিয়ে গেল।

—সামনের মাসেই ! হুঁ ! কিন্তু লোকটি তো এ আর পি'র চাকরিতে সামান্য মাইনে পায়। বৌকে খাওয়াবে কী করে ঐ কটা টাকার রোজগারে ?

—কলকাতা শহরে নিজেদের বাড়ি।

—হ্যাঁ। তা একটা বাড়ি ওদের আছে বটে।

—তুমি দেখলে, দেখলে ? ওদের বাড়িতে গিয়েছিলে ?

—গেছি। বেশ বড় বাড়ি। সংসারটিও বড়। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন তো হবেই। অনেক শরিক।

—অত বড়ো সংসার যখন, তখন আমার মেয়ের খাওয়া-পরা ঠিকই জুটে যাবে। ওদের বিশেষ কিছু দাবি নেই বললো।

—কিছুই দাবি করেনি ?

—দশ ভরি সোনা চেয়েছে। আর পাঁচশো টাকা নগদ।

—হুঁ, বেশি কিছু চায়নি। কিন্তু ব্রজবাবুর ঐ শালাটির বিয়ের জন্য কেন এত গরজ, তা কিছু বলেনি ?

—ব্রজবাবু তো বললেন, সামনের মাসেই ভালো লগ্ন আছে। দেরি করে লাভ কী ?

—তা ছাড়াও আর একটা কারণ আছে বৌদি। ঐ শ্যামসুন্দরের বউ মারা গেছে ছ' মাস আগে। সেই বউ একটা দেড় বছরের বাচ্চা রেখে গেছে।

—অ্যাঁ ?

—বাচ্চাটার দেখাশুনো করার জন্য একজন লোক চাই তো। তাই শ্যামসুন্দর বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত। ওর মাও ঘর খালি রাখতে চায় না।

—শ্যামসুন্দরের আগে বিয়ে হয়েছিল ?
—বিয়ে না হলে একটা দেড় বছরের ছেলে থাকবে কী করে ?
—তুমি ঠিক জানো? তুমি কী বলছো ইন্দু ?
—না জেনে কি এসব কথা বলা যায় !
—কিন্তু ছেলে যে দোজবরে, সে কথা তো ব্রজবাবু একবারও বললেন না ?
—আপনারা কি ছেলে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন ! জিজ্ঞেস করলে তিনি বোধহয় মিথ্যে বলতেন না। পরে তো আপনারা জানতেই পারতেন !
—না, না। দোজবরের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো না। কিছুতেই না !
ইন্দুদা হাসতে লাগলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, আর অন্য সব দিক থেকে কিন্তু শ্যামসুন্দর পাত্র খারাপ নয়। পাড়ায় নাম ডাক আছে। যে-কোনো বাড়িতে কেউ মরলে, যত রাত্তিরই হোক, শ্যামসুন্দর শ্মশানে যাবার জন্য কাঁধ দেয়।
মা আতঙ্কিতভাবে বললো, থাক, থাক, ওর কথা আর শুনতে চাই না।
বাবা রত্তিরে এসে সব শুনে বললো ছেলেটা তো মহা ফেরেরবাজ ! আগে বিয়ে ছিল। সে কথা বলেনি, তার ওপর আবার দশ ভরি সোনা চায় ! পাঁচশো টাকা নগদ ! এই সব ছেলেকে জুতো মারা উচিত !
বাবার অবশ্য অন্য একটা ভয় হলো।
ব্রজবাবুর শালার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হলো না বলে ব্রজবাবু আবার চটে গিয়ে বাবার চাকরিটা খাবে না তো? ব্রজবাবু লোক সুবিধের নয়।
অবশ্য আসল মালিক, ব্রজবাবুর দাদা এখনো বেঁচে আছেন।

বাবার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর ধারণা, ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা চুরি করে না।

ব্রজবাবু সে রকম কিছু গোলমাল পাকালেন না। সহজ ভাবেই মেনে নিলেন।

দিদির জন্য আরও পাত্র দেখা চলতে লাগলো। ইন্দুদা ভালো ভালো ছেলের কথা শোনান। বি এ পাশ, ভালো চাকরি করা পাত্র, নিজস্ব বাড়ি। শিগগিরই পাত্রপক্ষের লোক আসবে দিদিকে দেখতে। কিন্তু তারা আর আসে না।

এর মধ্যে বর্ধমানেরও দুটি পাত্রের বাড়ির লোকজন দিদিকে দেখে গেল। দিদিকে তাদের অপছন্দ নয়। কিন্তু তাদের দাবি দাওয়া অনেক।

একদিন বেলা এগারোটার সময় এলো ইন্দুদা। হাতে ঝোলানো একটা ইলিশ মাছ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে খানিকটা গড়িয়ে নিল ইন্দুদা। এক সময় মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ধড় মড় করে উঠে বসে মাকে বললো, বউদি, রানীকে একটা ভালো শাড়ি পরে নিতে বলুন তো! ওকে নিয়ে আমি আজ একবার চন্দননগরে যাবো!

মা দারুণ চমকে গিয়ে বললো, চন্দননগর? সেখানে গিয়ে কী করবে?

ইন্দুদা বললো, এমনি ঘুরে আসবো। ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। তাকে কথা দিয়েছি। বেশি দূর তো নয়। সন্ধের একটু পরেই ফিরে আসবো!

মা একটু চিন্তা করে বললো, ঠিক আছে, যাও না। মনিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। একবার বর্ধমানে এসে পড়ার পর ওদের তো আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না!

ইন্দুদা বললো, মনির যাওয়ার দরকার নেই। সেখানে তো ওর

বয়েসী কেউ থাকবে না, ও একা একা কী করবে ?

মা বললো, তা হলে রানীই যা ! তৈরি হয়ে নে !

দিদি গম্ভীরভাবে বললো, আমি যাবো না।

ইন্দুদা বললো, কেন। যাবে না কেন ? বউদি তো বলছেন তোমাকে যেতে !

দিদি বললো, আমি যাবো না, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না !

মা বললো, অমন করছিস কেন, রানী ! যা না ঘুরে আয়। ইন্দু এত করে বলছে !

দিদি হঠাৎ ফেটে পড়ে তীব্র চিৎকার করে বললো, আমি যাবো না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না !

আমার বুকটা কাঁপছে। আবার সেই চন্দননগর। এই নামটা শুনলেই দিদি কেন এত রেগে যায়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

ইন্দুদাও খুব জেদী। কড়া গলায় বললো, যাবে না মানে ? তুমি আমার একটা কথা শুনবে না ? তোমায় যেতেই হবে !

দিদি রক্তচক্ষে তাকিয়ে বললো, আমি না গেলেও আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে ? আমি মরে গেলেও যাবো না !

দিদি ছুটে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিলো দরজা।

মা ভয় পেয়ে গিয়ে বললো, ও রানী, কী পাগলির মতন করছিস, দরজা খোল ! দরজা খোল ! তোকে যেতে হবে না।

ভেতরের দেয়ালে দিদি জোরে জোরে মাথা ঠুকছে আর কাঁদছে।

মায়ের শত অনুরোধেও দিদি দরজা খুললো না।

আমাদের বাড়িতে আগে কখনো এরকম চ্যাঁচামেচি হয়নি। মা জোরে কথা বলে না। বাবা অনেক সময় আমাকে বা দিদিকে বকুনি দিতে গেলেও ঘরের দরজা বন্ধ করে নেয়।

আজ পাশের ভাড়াটেদের মাসিমা এসে উঁকি দিয়ে বললো, কী হয়েছে, সুধা ? কে কাঁদছে ? কারুর কোনো বিপদ হয়েছে নাকি !

মা অনুনয়ের চোখে ইন্দুদার দিকে তাকালো ।

ইন্দুদা বললো, আপনি যান বৌদি, আমি দেখছি। রানী ঠিক আমার কথা শুনবে !

মা বারান্দায় চলে যেতেই ইন্দুদা বাথরুমের দরজায় মুখ ঠেকিয়ে বললো, রানী, দরজাটা খোলো। কেন ছেলেমানুষি করছো? আমি যখন বলেছি,তখন আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, তোমাকে যেতেই হবে চন্দননগরে আমার সঙ্গে ।

তারপর হঠাৎ পাশ ফিরে আমাকে কাছাকাছি দেখতে পেয়ে ইন্দু-দা দাঁত খিঁচিয়ে বললো, এই মনি, তুই এখানে কী করছিস, যা, যা, বাইরে যা !

বাথরুমটা আমাদের শোবার ঘরের সঙ্গেই । ইন্দুদা শোবার ঘরের দরজাটাও বন্ধ করে দিলো ভেতর থেকে। তারপর সেখানে ছুটো-পাটি, কান্নাকাটি, ধমকাধমকি চলতে লাগলো অনেক রকম ।

আধঘণ্টা বাদে শোবার ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো ইন্দুদা। হাসিমাখা মুখ।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কী, রানী, বেরিয়েছে ?

ইন্দুদা বললো, হ্যাঁ । আবার একটু মুখ টুখ ধুয়ে নিচ্ছে। বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেছে এখনো । বউদি, এক কাপ চা খাওয়াবেন না ?

রান্নাঘরে মা কেতলিতে গরম জল চাপালো, তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো ইন্দুদা। তারপর বললো, বউদি, সামনের মাসে আমার বি এ পরীক্ষা। আমি হয়তো আর এক মাস এখানে আসবো না।

মা বললো, ও বুঝেছি। আগের বার রানীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বলেই তুমি অনেকদিন আসোনি, তাই না ?

ইন্দুদা বললো, না, তা নয়। এখন একমাস তো মন দিয়ে পড়তেই হবে। আজ আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনি ভেবে উত্তর দেবেন। জামাইবাবুর সঙ্গেও আলোচনা করবেন।

তারপর হঠাৎ থেমে গেল ইন্দুদা।

মা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বলবে। বলো !

—আপনি রাগ করবেন না ?

—তোমার কথায় রাগ করতে পারি ? সে রকম কোনো কথা তুমি বলতেই পারো না।

—বউদি, আপনারা তো রানীর বিয়ের জন্য খুব চেষ্টা করছেন। পাত্র হিসাবে আমি কি খুব অযোগ্য ? আপনারা আমার কথা একবারও ভাবেননি কেন ?

মায়ের মুখে যেন একই সঙ্গে আনন্দ আর গভীর দুঃখ ঢেউ খেলতে লাগলো। যেন মা খুশিতে চিৎকার করে উঠবে কিংবা তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়বে।

সে রকম কিছু হলো না। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো, ইন্দু ! এ কখনো হয় নাকি !

—কেন হতে পারে না ?

—তোমাকে আমি আমার ছেলের মতন দেখি। তুমি আমাদের জন্য যা করো, অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও তা করে না। তা বলে বেশি লোভ করা তো উচিত নয়।

—আমি রানীকে বিয়ে করতে পারি না ?

—তা কী করে হবে ? তোমার বাবা-মা রাজি হবেন কেন ? দেখছোই তো, আমরা কত গরিব হয়ে গেছি। চালচুলো নেই। তুমি লেখা-পড়া জানা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তোমার বাবা-মা, আত্মীয়

স্বজন ভাববে, আমরা তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার হাতে আমাদের মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছি ! না ইন্দু, এসব কথা আর বলো না। তোমার খুব ভালো বিয়ে হবে। অনেক ধুমধাম হবে। আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাবো !

—বউদি, আমার বাবা বেঁচে নেই। আমার মা আমাকে এতই ভালোবাসে যে আমার ইচ্ছেতে কখনো অমত করে না। আমি নিজের পছন্দ মতন বিয়ে করবো, এ কথা অনেক আগেই মাকে বলে রেখেছি। আমার বাবা মৃত্যুর আগে মাকে বলে গিয়েছিলেন, বি এ পাশ না করিয়ে ছেলের বিয়ে দিও না। বাবার সেই কথাটা আমি রাখবো। সেই জন্যই এতদিন আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি। এক মাস বাদে আমার পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে, তারপরেই আমি চাই···

—ইন্দু, ইন্দু তুমি কী বলছো? তোমার কথা এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। রানী কি তোমার যোগ্য ? অবুঝ, জেদী মেয়ে। তাছাড়া তোমাকে আমরা কী দেবো, কিছুই যে নেই।

—আর কী দেবেন বৌদি ? রানীর মতন মেয়ে কটা হয় ? আমি ঠিক জানি, রানীকে দেখলেই আমার মা পছন্দ করবেন ! আমাদের যা বিষয় সম্পত্তি দেশে আছে, তাতে একটা জীবন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

মা তক্ষুনি বাবাকে খবর দিতে চাইলো। কিন্তু ইন্দুদা আর অপেক্ষা করতে পারবে না। চা খেতে খেতে পায়ে চটি গলিয়ে বললো, ব্যস্ততার তো কিছু নেই। দেখুন আগে দাদার মত আছে কি না ! যদি তিনি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন···আমি কাল পরশুর মধ্যে আর একবার আসবো···

বলাই বাহুল্য, বাবাও এ খবর শুনে খুশি ধরে রাখতে পারলো না। মা আর বাবা দু' জনেরই মনে মনে এই ইচ্ছেটা আগে থেকেই

বাসা বেঁধেছিল, আজ বেরিয়ে পড়লো। বাবার আরও আনন্দের কারণ, এ বিয়েতে বিশেষ কিছু খরচ হবে না। মায়ের গয়না বেশ কিছু বিক্রি হয়ে গেলেও এখনো প্রায় পনেরো ভরির মতন আছে। তার থেকে ভরি দশেক মেয়ে-জামাইকে দেওয়া হবে। বাকিটা বিক্রি করে নেমন্তন্নর খরচ কুলিয়ে যাবে।

বাবার সঙ্গে মায়ের এত সব কথা হলো রান্নাঘরে বসে। দিদিকে ডাকা হলো না সেখানে।

রাত্তিরে শোবার সময় আমি বললাম, মা, দিদির জ্বর হয়েছে। গা গরম!

মা দিদির গালে হাত ছুঁইয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিকই তো। বাবা রে বাবা, যা কাণ্ড করলি আজ বিকেলে? আমার তো ভয়ই ধরে গিয়েছিল। অমন ভাবে দেয়ালে মাথা ঠুকলে জ্বর আসবে না? কপালটাও তো দেখছি ফুলে গেছে। ভালো করে ঘুমো দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে!

দিদি পাশ ফিরে বললো, মা, একটা কথা বলে দিচ্ছি। আমাকে যেন কেউ আর কখনো চন্দননগর যেতে না বলে। আমি কিছুতেই যাবো না।

মা বললো, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

দিদি আবার বললো, ঐ ইন্দু নামের লোকটা মাছ নিয়ে এলেই তুমি রান্না করে খাওয়াবে, তা খাওয়াও। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে এক বিছানায় ঘুমোবে, সেটা বারণ করতে পারো না? একটা তো মোটে ঘর। এর মধ্যে একটা বাইরের লোক থাকলে অস্বস্তি হয় না?

মা বললো, বাইরের লোক বলছিস কাকে? ইন্দুর মতন আমাদের আপন আর কে আছে? আর দু'দিন বাদে সে এই পরিবারের জামাই হতে যাচ্ছে।

দিদি ফুঁসে উঠে বললো, তার মানে। কে ওকে বিয়ে করবে? আমাদের কিছু উপকার করেছে বলে কি একেবারে মাথা কিনে রেখেছে নাকি? আমি মোটেই ওকে বিয়ে করবো না! তোমরা আমার মতামতটাও জানতে চাও না?

মায়ের মনে যতখানি রাগ, দুঃখ, অভিমান ও অপমানবোধ ছিল, সব যেন এক সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলো।

মা ঠাস ঠাস করে দিদির দু' গালে থাপ্পড় মারতে মারতে বললো, হারামজাদি, তুই আমাকে অনেক জ্বালিয়েছিস। ফের যদি তুই এমন কথা বলিস, তা হলে আমি নিজের হাতে তোকে শেষ করবো।

বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, ছুটে এসে বললো, কী হলো? কী হলো?

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে বাবা আর মা দু' জনে মিলে দিদিকে বকুনি, গালাগালি ও চড় চাপড় মেরে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গেল যে তারপর দিদির সামনে আর মাত্র দুটো পথ খোলা রইলো। হয় আত্মহত্যা করা অথবা বাবা মায়ের কথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া।

আত্মহত্যার সাহস হলো না দিদির। সে একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল।

দু'দিন বাদে আবার দুপুরের দিকে এলো ইন্দুদা। মায়ের সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করার পর দিদিকে মিষ্টি গলায় বললো, তৈরী হয়ে নাও, রানী, চন্দননগর থেকে চট করে ঘুরে আসবো একবার।

একটুও প্রতিবাদ করলো না দিদি।

ফিরে এলো রাত প্রায় সাড়ে ন' টার সময়। একা। ইন্দুদা পৌঁছে দেয়নি। স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা নিয়ে দিদি একা ফিরেছে এত রাতে। মাথার চুল বিস্রস্ত, চোখ দুটি স্থির, মুখে কোনো কথা

নেই। দিদির ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে।

ইন্দুদা অবশ্য কথার খেলাপ করেনি। বি এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার ঠিক এগারো দিন পর ইন্দুদার সঙ্গে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। বড় মামাদের নেমন্তন্নর চিঠি পাঠানো হয়েছিল, তারা আসেনি। তসলিমাকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। তসলিমা আসতে না পারলেও চিঠি দিয়েছিল একটা, সে চিঠি আমাকে পড়তে দেয়নি দিদি।

বিয়ের দিন সবাই বলেছিল, দিদির সঙ্গে ইন্দুদাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে!

১০

যুদ্ধ চলার সময় এ দেশের কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে আর মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে !

যুদ্ধ শেষ হবার বিশেষ আনন্দ-উল্লাস বোধ করা গেল না, তখনও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রেশ রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় প্রচুর লোককে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, এখন শুরু হয়ে গেল ছাঁটাই। বহু পরিবার নতুন করে পথে বসলো।

পরের বছরই কলকাতার ইতিহাসে বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইংরেজ পক্ষ যুদ্ধে জিতলো বটে, কিন্তু তখনও ধুঁকছে। তাদের অর্থনীতি তছনছ হয়ে গেছে, বাহুবল বলতেও কিছু নেই, সাম্রাজ্য রক্ষা করা দায়। সুভাষ বসু জাপানীদের সাহায্য নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে একটা ধাক্কা দিয়েছিল, ওদিকে বোম্বাইতে হলো নৌবিদ্রোহ। ইংরেজ বুঝলো যে ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে আর ভারত শাসন করা যাবে না। বরং এখন দিল্লীর মসনদ ছেড়ে দিলে ভারতে অধিষ্ঠিত ইংরেজদের ধন-প্রাণ রক্ষা করা যাবে।

যুদ্ধে পশ্চাৎ অপসরণের সময় পোড়া মাটি নীতি অবলম্বন করা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। চলে যাবার সময় ইংরেজ আগুন লাগালো না বটে, কিন্তু ভারতের পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দিয়ে গেল। ভারতীয় নেতারাও সেই ছুরিটার নামই মনে করলেন স্বাধীনতা। দু' খণ্ড হয়ে গেল দেশ, সীমান্তের দু' দিকেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ পরিবার।

আমাদের অবশ্য তেমন কিছু ক্ষতি হলো না। সর্বহারাদের যেমন কিছু হারাবার ভয় নেই। সেই রকমই, আমাদের পূর্ববঙ্গে কোনো বিষয়সম্পত্তি ছিল না বলে আমাদের কিছু হারাতেও হলো না, আমরা রিফিউজিও হলাম না। যেমন ছিলাম তেমনই রইলাম।

বরং দু' তিন বছর বাদে আমাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। বর্ধমানে ব্রজবাবুদের পেট্রল পাম্প বেশ ভালোই চলছিল, এই ব্যবসার ঘাঁতঘোঁত জেনে গিয়ে তারা কলকাতায় সাহেবদের কাছ থেকে আরও দুটো পেট্রল পাম্প কিনে ফেললো। তার মধ্যে ভবানীপুরের পাম্পের ম্যানেজার করে পাঠালো বাবাকে।

আবার আমরা কলকাতা শহরে প্রবেশের অধিকার পেলাম।

এবারে ভাড়া নেওয়া হলো একটা একতলা ছোট বাড়ি। তিনখানা ঘর, দু' দিকে দু' চিলতে বারান্দা। পিছন দিকে ছোট উঠোন। ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই, পুরোনো বাড়ি, এক পাশের দেয়াল ফাটিয়ে বট গাছের চারা উঠেছে।

তবু মায়ের এই বাড়ি বেশ পছন্দ হলো। সব মিলিয়ে তো নিজস্ব। ভাড়াও খুব বেশি নয়, বাইশ টাকা।

তখনও কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার আকাল শুরু হয়নি। অনেক বাড়ির গায়ে 'টু লেট' টাঙানো থাকে। আমাদের বাড়িওয়ালা প্রথমে তিরিশ টাকা চেয়েছিল, বাবা তাই শুনে, 'ওরে বাবা, এত' বলতেই দর কমতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত রফা হলো বাইশ টাকায়।

স্বাধীনতার ঠিক পরের বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এমনই ঢালাও ব্যবস্থা ছিল যে অনেকে বলেছিল, গরু-ছাগলও পরীক্ষায় বসলে পাশ করে যেত। সেবারেই পাশ করলাম আমি। ভর্তি হয়েছিলাম ইটাচুনা কলেজে। ট্রান্সফার নিয়ে চলে এলাম কলকাতার আশুতোষে।

বাবার পুরোনো ফুল প্যাণ্ট এখন আমার লেগে যায়। বাসের কণ্ডাক্টর আমাকে আপনি বলে।

স্বাধীনতার পর পরই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল বাসুমামা। কিন্তু সর্বব্যাপি ডামাডোলের জন্য কলকাতায় আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতে পারেনি। বাসুমামা কলকাতায় শেষপর্যন্ত এলো সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায়।

আমার মামারা পূর্ব পাকিস্তানে বেশি দিন টিকতে পারলেন না। বড় দাতু কিছুতেই নিজের বাড়ি ছেড়ে আসতে চাননি, কিন্তু পঞ্চাশ সালের দাঙ্গার পর সেখানে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

আমিনুল চৌধুরী সাহেব আগেই মারা গেছেন। অত বড়ো একজন বন্ধু চলে যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়লেন বড়ো দাতু। উগ্র মুসলিম লীগপন্থীরা হামলা করতে লাগলো নানা রকম। বাসুমামা শান্তি কমিটি করে মিছিল সংগঠন করতে লাগলো। ঢাকা শহরে গুণ্ডাদের হামলায় শান্তি কমিটির কয়েকজন নিহত হলো। মদারিপুরের এক মিছিলে বাসুমামার ঘাড়ে একজন ল্যাজা (বর্শা) বিঁধিয়ে দিলো, বাসুমামা মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে।

রাতারাতি সব কিছু ছেড়ে বড়ো দাতু, বড়ো মামা, বড়ো মামিমা, আর সবাই বাসুমামাকে নিয়ে স্টিমারে উঠে পড়লো। খুলনা থেকে অনেকখানি রাস্তা তাঁদের পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল। একেবারে রিফিউজিদের মতন তাঁরা কোনোক্রমে পৌঁছোলেন কলকাতায়। তখনও বাসুমামার প্রাণটা ধুক ধুক করছে।

তখন শিয়ালদা স্টেশন আর শহরের বহু ফুটপাত উদ্বাস্তুতে থিক-থিক করছে। বড়োমামারাও তু' দিন শিয়ালদা স্টেশনেথাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তারপর বেলেঘাটার এক বস্তিতে তু' খানা ঘর ভাড়া করলেন।

শেষের দিকে আমাদের সঙ্গে আর চিঠিতেও যোগাযোগ রাখতেন না বড়ো মামা। আমাদের কলকাতার ঠিকানা জানতেন না। বর্ধমান থেকে একখানা চিঠি ঘুরে আসার পর আমরা ওদের খবর জানতে পারলাম।

মা আর আমি ছুটে গেলাম বেলেঘাটায়।

মা প্রচুর কান্নাকাটি করলো, বড়ো মামা-বড়ো মামিমাও সব দুঃখের কথা জানালো। আমার একজন মেজো মামা ছিল, সে চাকরি করতো বাইরে বাইরে, তাকে বিশেষ দেখিনি, শোনা গেল সে সস্ত্রীক রয়েছে করাচিতে, তার ভাগ্যে কী ঘটেছে কেউ জানে না।

মা-বড়ো মামাদের কান্নাকাটির সময় আমি বসে রইলাম বাসুমামার বিছানার পাশে। তার তখন কথা বলারও ক্ষমতা নেই। শম্ভু আর রতনও কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেছে।

আমি চেনাশুনো সবাইকে খুঁজে খুঁজে রতনকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, বড়ো পিসিমা কোথায়?

রতন শুকনো গলায় বললো, আসেনি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ঠাইরেন দিদি?

রতন বললো, সেও আসেনি।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ঐ দুই বৃদ্ধা কি আসতে চায়নি, না তাদের ফেলে আসা হয়েছে? ওরা কেউই আমাদের নিকট আত্মীয় নয়। কিন্তু সারাজীবন ওদের মামাবাড়ির সবাইকে সেবা করতে দেখেছি। এ রকম বিপদের দিনে অত বড়ো পরিত্যক্ত বাড়িতে পড়ে আছে সেই দুই বুড়ি।

মামা বাড়িতে আরও তো লোক ছিল। নিকুঞ্জ, নাদের আলি, লক্ষ্মণ। তাদের কথা জিজ্ঞেস করতে রতন উত্তর না দিয়ে শূন্য চোখে চেয়ে রইলো।

নিজের বাপের বাড়ির লোকেদের এ রকম একটা নোংরা বস্তিতে রাখতে মা কিছুতেই রাজি নয়। মা সবাইকেই নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় এক্ষুনি।

কিন্তু বড়ো দাদু সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিলেন। প্রাণ যায় যাক, তবু তিনি মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন না। আরও অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন বড়ো দাদু, গলার আওয়াজে সেই তেজ আর নেই, তবু মনের জোর আগেরই মতন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, আপাতত বাসুমামা আর রতনকে নিয়ে রাখা হবে আমাদের কাছে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকা হলো। আসবার সময় মা বড়ো দাদুর হাঁটু জড়িয়ে ধরে আবার অনেকক্ষণ কাঁদলো।

বাসুমামার চিকিৎসার জন্য যমে-মানুষে টানাটানি চললো কয়েকটা দিন। তার পিঠে ঘা-এ সেপটিক হয়ে গিয়েছিল। সেটাও খুব ভয়ের কথা নয়। বর্শার আঘাতটা লেগেছিল তার ঘাড়ের নিচে শিরদাঁড়ায়। তাতেই তার দুটো হাত আর পা অবশ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কথাও জড়িয়ে গেছে।

এবারে কলকাতায় এসে আমাদের যে-টুকু সচ্ছলতা এসেছিল, তাও অন্তর্হিত হয়ে গেল। বাসুমামার চিকিৎসার খরচ কম নয়। তা ছাড়াও মা তার বাপের বাড়ির লোকদের জন্য প্রায়ই এটা সেটা পাঠায়। চাল পাওয়া যায় না, কয়লা পাওয়া যায় না। এমনকি শাড়িও পাওয়া যায় না। আমিই এই সব জিনিস কিছু কিছু জোগাড় করে বেলেঘাটার বাড়িতে দিয়ে আসি মাঝে মাঝে।

সব অবস্থাই স্বাভাবিক হয়ে যায় এক সময়। মানুষের ভিড়ে ঠাসা ট্রেন দেখলে মনে হয় আর এক তিলও জায়গা নেই, কিন্তু ট্রেনটা চলতে শুরু করলে দেখা যায় সকলেরই কোনোক্রমে জায়গা হয়ে গেছে।

দিন পেরিয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ পেরিয়ে মাস চলতে লাগলো, তারপর এই অসহ্য অবস্থাটাই সহনীয় হয়ে গেল।

বড়ো দাছু আর বেশিদিন নিজেকে ছেলেমেয়ের ঘাড়ের বোঝা করে রাখলেন না। বেলেঘাটার সেই বস্তির ঘরেই তিনি ঠিক চার মাসের মাথায় একদিন পাকাপাকি চোখ বুজলেন। রাত্তিরে ঘুমের মধ্যেই প্রাণটা চলে গেছে, কেউ টেরও পায়নি, সকালে উঠে বড়ো মামা দেখলো তার বাবার বুকের ওপরে প্রণামের ভঙ্গিতে হাত দুটো জোড় করা, চোখ দুটো উল্টে গেছে।

বড়ো মামা এর পর বস্তি ছেড়ে কাছেই একটা পাকা বাড়িতে দেড় খানা ঘর ভাড়া নিয়ে আবার ভদ্রশ্রেণীতে উন্নীত হলেন। কিন্তু খরচ চলে না। বড়ো মামিমা তার গয়নাগুলো সব সময় আঁকড়ে ধরে আছেন, কিছুতেই বিক্রি করতে দেবেন না। বড়ো মামা বরাবর জমিজমা দেখেছেন। চাকরি করেননি, কলকাতায় তিনি কী চাকরি করবেন! তবে, দেশে থাকতেই ওঁর পুজো-আর্চায় খুব মন ছিল, মন্ত্র-টন্ত্র অনেক মুখস্থ, চেহারাটাও সুন্দর, তিনি শুরু করে দিলেন পুরুতের কাজ। কিছু কিছু রোজগার হতে লাগলো। শম্ভু একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়লো, প্রেসক্রিপশন দেখে দেখে তাক থেকে ওষুধ পেড়ে দেয়। মাইনে পায় চল্লিশ টাকা। মোটামুটি খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা ঘুচে গেল এই পরিবারের।

বাস্থুমামাও সেরে উঠলো আস্তে আস্তে। পুরোপুরি সারলো না অবশ্য। উঠে দাঁড়ালো বটে কিন্তু ঘাড়টা বেঁকে রইলো, একটা পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। হাত দুটো ঠিক হয়ে গেল।

বাবা বাস্থুমামার জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিলো।

পেট্রল পাম্পেই একটা ছাউনির নীচে চেয়ারে বসে থাকে। বাসের কণ্ডাক্টারদের মতন একটা ব্যাগ গলায় ঝোলানো। যারা তেল নিতে আসে, তাদের কাজ থেকে টাকা নেয়। খুচরো ফেরত দেয়।

বিল কাটে। বসে বসে কাজ, তাই অসুবিধে নেই।
বাসুমামাকে সেই ভাবে বসে থাকতে দেখে আমার বর্ধমানের পেট্রল পাম্পের রামুর কথা মনে পড়ে।
রামু কত দেশ ঘুরেছে। মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে যুদ্ধ করেছে, সাহেবদের মতন ইংরিজি বলে। তবু রামুর কী পরিণতি! ছেঁড়া খোঁড়া জামা পরে সে পেট্রল পাম্পে অতি সামান্য কাজ করে আর গাঁজা খায়। অনেকেই তার পুরোনো পরিচয়টা জানে না।
বাসুমামা আমাদের কত দেশাত্মবোধক গল্প শোনাতো। দেশের কাজ করতে গিয়ে জেল খেটেছে। দেশ স্বাধীন হবার পরেও দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিল। সেটাও তো দেশের কাজ। কিন্তু কোথায় সেই দেশ? কেউ তাকে মনে রাখেনি।
বাসুমামা কোনো ক্ষোভের কথা, তিক্ততার কথাও বলে না। সব মেনে নিয়েছে শান্তভাবে।
কৃষ্ণনগর থেকে দিদির একট চিঠি পেলাম। দিদি লিখেছে, মনি, তুই একবার আসতে পারবি? কতদিন তোকে দেখিনি!
বিয়ের পর দিদি একবারই মাত্র এসেছিল আমাদের কাছে। মানু জন্মাবার সময় থেকে গিয়েছিল প্রায় এক মাস। তারপর আর অত ছোট বাচ্চাকে নিয়ে আসার সুবিধে হয় না।
ইন্দুদা আমাদের পরিবারের এত বড়ো উপকারী বন্ধু ছিল। যেই সে জামাইবাবু হয়ে গেল, তারপর থেকে তাকে আমরা সেই ভূমিকায় হারালাম। ওদের বাড়ির কেতা অনুযায়ী শ্বশুরবাড়িতে ঘন ঘন যেতে নেই। বিয়ের আগে আর বিয়ের পরে সম্পূর্ণ আলাদা সম্পর্ক। ইন্দুদাকে জামাইষষ্ঠীর নেমতন্ন করলেও আসে না।
বি এ এবং ল পাশ করে ইন্দুদা খুলনা কোর্টে প্রাকটিস শুরু করেছিল। তারপর দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সব সম্পত্তি বিক্রি করে চলে এলো কৃষ্ণনগর। সেখানে আগে থেকেই ওদের

খানিকটা জমি ও একটা ছোট বাড়ি ছিল। পৈতৃক বাড়ি কিংবা জন্মস্থান সম্পর্কে অনাবশ্যক মোহ নেই ইন্দুদা'র। তার মতন এত তাড়াতাড়ি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রি করতে পেরেছে, এমন লোক খুব কমই আছে। এমনকি খাট-আলমারিও আনতে ছাড়েনি। ইন্দুদা দেওয়ালের লিখন ঠিক পড়তে পেরেছিল।

শান্তি মাসির বর এবং ইন্দুদার অন্যান্য আত্মীয়রা ভিটে আঁকড়ে পড়েছিল অনেক দিন। তারপর তারা খুব ঝামেলায় পড়েছিল। ইন্দুদা কৃষ্ণনগরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেললো আবার।

দিদির চিঠি পেয়ে আমি দু' দিন পরেই উপস্থিত হলাম কৃষ্ণনগর। দিদিদের বাড়িটা স্টেশন থেকে বেশ দূরে, ঘূর্ণি পেরিয়ে। এদিকে অনেক গাছপালা, প্রায় গ্রাম গ্রাম চেহারা। বাড়ির সঙ্গে বাগান ও পুকুর। ইন্দুদার নিজস্ব সাইকেল রিক্সা আছে, তাতে সে শহরে যাতায়াত করে।

আমি বিকেলে পৌঁছে ইন্দুদাকে বাড়িতে পেলাম না।

দিদি প্রথমেই আমাকে ফিসফিস করে বললো, তুই আমার শাশুড়িকে বলবি, তুই আমাকে নিতে এসেছিস। মায়ের অসুখ কিংবা বাবার শরীর খারাপ, একটা কিছু বানিয়ে বলে দিবি!

দিদির শাশুড়ি চোখে প্রায় দেখতেই পান না। কানেও ভালো শুনতে পান না মনে হলো। তাঁকে প্রণাম করার পর অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে হলো, আমি ঠিক কে। দিদিকে আমি নিয়ে যেতে চাই শুনে তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না।

ইন্দুদার বিধবা বড়দিও বাস্তুহারা হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তার তিনটি ছেলেমেয়ে। সেই দিদির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনিই এই সংসারের কর্ত্রী। তাঁকে আমি আগে কখনো দেখিনি। আমাকে ভালো করে খাওয়াবার জন্য তিনি সেই সন্ধেবেলাতেই

কাজের লোককে বাজারে পাঠালেন মাছ কিংবা মাংস আনবার জন্য। তার আগে আমি ভালো ভালো মিষ্টি খেলাম অনেকগুলো। সরভাজা আমি জীবনে কখনো খাইনি।

দিদির সঙ্গে সুখ-দুঃখের নানা রকম গল্প করতে করতেই কেটে গেল সারা সন্ধে।

রাত সাড়ে নটা বাজলো, তবু ইন্দুদা ফিরলো না।

দিদি বললো, তুই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। কতক্ষণ বসে থাকবি? ট্রেনে এসেছিস, অনেক ধকল গেছে।

আমি বললাম, বাঃ, ইন্দুদার সঙ্গে দেখা না করে শুয়ে পড়বো?

দিদি বললো, ও কখন ফিরবে, কোনো ঠিক নেই। এক একদিন এগারোটা-বারোটাও বেজে যায়।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতো রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে?

উত্তর না দিয়ে দিদি হাসলো।

আমি তবু বললাম, কী হয়েছে সত্যি করে বলতো, দিদি!

দিদির মুখের হাসিটা কেমন যেন ধারালো হয়ে এলো। সেই রকম হাসি ঠোঁটে রেখে বললো, তোর মনে আছে, ওর কী রকম উপকার করা স্বভাব ছিল? মায়ের জন্য কতো জিনিস এনে দিতো, কতো পয়সা খরচ করতো, সারা দিন পড়ে থাকতো আমাদের বাড়িতে। সেই স্বভাবটা ওর এখনও যায়নি। এখনো এক একটা পরিবারের খুব উপকার করে। প্রাণ ঢেলে দেয়। দু' হাতে টাকা ওড়ায়।

আমি বললাম, তা হলে ইন্দুদা বদলায়নি বিশেষ?

দিদি বললো, না, বদলায়নি। তবে একটা কথা তোরা জানতিস না। ওর উপকারের নেশা এক জায়গায় ছ' মাসের বেশি থাকে না। ছ' মাস বাদে একটা একটা পরিবারকে ছেড়ে দেয়। তাদের কথা মন থেকে মুছেই ফেলে। আবার অন্য একটা পরিবার ধরে।

আবার তাদের নিয়ে মেতে ওঠে। এটা ওর একটা খেলা।
হঠাৎ থেমে গিয়ে দিদি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। যেন আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু বলছে না। সেই না বলা কথাগুলো আমিও যেন একটু একটু বুঝতে পারছি, তাই জিজ্ঞেস করতে পারছি না।
একজন লোক যদি মানুষের উপকার করে, তাতে আপত্তি করার কী আছে? অন্তত আমার দিদি কখনো আপত্তি করতে পারে না! কিন্তু এই উপকারের মধ্যে যেন আরও কিছু ব্যাপার আছে।
এগারোটার বেশি আর আমি জাগতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়া বড্ড বেশি হয়েছে। তাই চোখ টেনে এলো ঘুমে।
পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙালো দিদি। তার কোলে মানু। ক্ষোভে ঝাঁঝালো গলায় দিদি বললো, চল মনি। আজই আমরা কলকাতায় চলে যাই।
আমি উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললাম, দাঁড়া, আগে ইন্দুদার সঙ্গে কথা বলি।
দিদি বললো, কার সঙ্গে কথা বলবি? সে আবার বেরিয়ে গেছে।
আমি চমকে উঠে বললাম, অ্যাঁ? কতো ঘুমিয়েছি আমি? এখন ক'টা বাজে রে?
ঘড়িতে দেখা গেল পৌনে আটটা। তা হলে তো খুব বেলা হয়নি। এর মধ্যেই বেরিয়ে গেল ইন্দুদা?
—কাল রাত্তিরে কখন ফিরলো ইন্দুদা?
—প্রায় বারোটার সময়।
—আবার আজ এতো সকালেই বেরিয়ে গেল? আমাকে আগে ডাকলি না কেন?
—শোন, মনি, আমি ওকে বলেছি তুই আমাকে নিতে এসেছিস। ওর কোনো আপত্তি নেই। আমার খুব মাকে দেখতে ইচ্ছে

করছে।
—তা বলে ইন্দুদার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবো? তা কখনো হয় নাকি? মা শুনলে রাগ করবে না? আজ ইন্দুদা কখন ফিরবে!
—কী জানি!
আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম।
একটু একটু অপমান বোধ হচ্ছে। আমি এসেছি জেনেও ইন্দুদা আমার সঙ্গে একবার দেখাও করলো না? হয়তো খুবই কোনো জরুরি কাজ আছে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিছু বলেও যায়নি। দিদির মেয়ে মানুর বয়েস দেড় বছর, এখনো ভালো করে কথা ফোটেনি!
কিন্তু মামা শব্দটা সে বেশ সহজেই বলতে পারলো। আমি মামা হয়ে গেছি! এই তো কিছুদিন আগে আমি গ্রামের মামাবাড়িতে বেড়াতে যেতাম। আমার সেই মামাবাড়ি আর নেই। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ছুরি আমার মামাবাড়িকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
এখন মানু যাবে তার মামার বাড়িতে। আমি তার একমাত্র মামা।
সারাদিন শুয়ে শুয়েই কাটালাম। কৃষ্ণনগর শহরটা দেখিনি, কিন্তু শহরে আর যেতে ইচ্ছে করলো না। মনটা ভালো লাগছে না। ইন্দুদাকে একেবারেই বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না দিদির, তা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে! তবে, সময়ে নাকি সব ঠিক হয়ে যায়। সবাইয়ের কাছেই তো শুনেছি, দিদি আর ইন্দুদার বিয়েটা খুব ভালো হয়েছে, ওরা খুব সুখে আছে।
ইন্দুদা আজ ফিরে এলো সন্ধের একটু পরেই।
আমাকে দেখে বেশ আন্তরিক ভাবেই বললো, এই যে মনি, এর মধ্যে কতো লম্বা হয়েছিস রে! আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি নাকি? কাল বিকেলে এসেছিস, এর মধ্যে তোর সঙ্গে কথাই বলতে পারিনি, ছাখ্ তো কী কাণ্ড। এতো মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাট

চলছে, বড্ড কাজ পড়েছে।

আমি বললাম, মা আমাকে পাঠিয়েছে, অনেকদিন দিদিকে আর মান্নুকে দেখেনি, একবার নিয়ে যেতে বলেছে। অন্তত দিন দশেকের

ইন্দুদা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যা না! ছাখ, আমি সময় পাই না। ওদের কোথাও নিয়ে যেতে পারি না। আমার নিজেরও কোথাও যাওয়া হয় না।

দিদি ফস করে বললো, তুমি এর মধ্যে অন্তত তিনবার কলকাতায় গিয়েছিলে!

দিদির এরকম ভাবে বাধা দেওয়াটা ইন্দুদার একেবারে পছন্দ হলো না। গম্ভীর নীরস গলায় বললো, সে নিছক কাজের জন্য। একদিন দেড়দিনের বেশি থাকিনি।

দিদি তবু বললো, ওরই মধ্যে একবার তুমি আমাদের রেখে আসতে পারতে মায়ের কাছে।

ইন্দুদা এবার দিদিকে পাত্তা না দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললো, দশ দিন কেন, আরও কয়েকটা বেশিদিনও ওরা থেকে আসতে পারে। আমি সময় করে গিয়ে ওদের নিয়ে আসবো।

তারপরেই প্রসঙ্গ পাল্টে ইন্দুদা বললো, মনি, তুই কোন কলেজে পড়ছিস যেন? আশুতোষ! বাড়ি থেকে তো কাছেই হয়।

আগে ইন্দুদা কখনো আমার সঙ্গে বেশি কথা বলতো না, আজ অনেক গল্প করলো। কোথা থেকে কেটে গেল সময়।

পরদিন সকালে হু' খানা সাইকেল রিক্সার ব্যবস্থা হলো। ইন্দুদার এতো কাজ, তবু সে আমাদের পৌঁছে দিতে এলো ট্রেনে। সব কটা টিকিট তো কাটলোই, তারপরেও আমার পকেটে জোর করে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললো, শিয়ালদা থেকে ট্যাক্সিতে বাড়ি যেও।

মান্নুকে কোলে নিয়ে আদর করলো খানিকক্ষণ। দিদিকে বললো, মেয়েকে সাবধানে রেখো। কলকাতা শহর, দেখো যেন হঠাৎ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে না যায়।

ট্রেন ছাড়ার পর জানলা ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে এলো ইন্দুদা। দিদিকে বললো, রানী, গিয়েই চিঠি দিও। তোমার মা-বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। মামনি, মামনি, টা-টা! টা-টা!

গাড়িটা প্লাটফর্ম ছাড়বার পরেও দেখলাম ইন্দুদা হাত নেড়ে চলেছে।

দিদির দু' চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে জলের ধারা।

একটু পরে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বললো, ও এবার ঠিক আর একটা বিয়ে করবে!

আমি আমূল কেঁপে উঠলাম। এ কী বলছে দিদি! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! ইন্দুদার চমৎকার ব্যবহারে আমারও তো চোখ ছলছল করছে।

দিদি বললো, আমাদের বিদায় দিয়ে কতো খুশি হয়েছে দেখলি না? ও এর মধ্যে আরও তিনবার বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। তাদের একজনকে সত্যি সত্যি বিয়ে করেই ফেলেছে কিনা কে জানে! আমি জানি, ঠিকই জানি, অন্তত দুটি মেয়েকে এর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল চন্দননগরে!

আবার সেই চন্দননগর! কী রহস্য আছে সেখানে? ইন্দুদা সেখানেই শুধু মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় কেন?

ট্রেনে বসে সে কথা বারবার জানতে চাইলেও দিদি কোনো উত্তর দিল না!

১১

জীবনলালের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা খুবই আকস্মিক। একটা ট্যাক্সি ঢুকেছিল পেট্রল পাম্পে। হঠাৎ সেই ট্যাক্সির দরজা খুলে একজন লোক নেমে এসে বাসুমামার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, বাসুবাবু না? আমায় চিনতে পারছেন?

বাসুমামা অপলকভাবে তাকিয়ে থেকে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলো না। সত্যি বাসুমামা প্রথমে চিনতে পারেনি।

বাসুমামা প্রায় পঙ্গু হয়ে গেলেও মুখখানা বদলায়নি বিশেষ। কিন্তু জীবনলালেব পরিবর্তন হয়েছে অনেক। মাথার চুল কাঁচা-পাকা, মুখখানা লম্বাটে হয়ে গেছে। আগে তার গায়ের রং ছিল খুব ফর্সা। এখন ফ্যাকাসে মতন, চোখ দুটোও যেন নিষ্প্রভ। একটু হাঁটলেই বোঝা যায়, তার একটা পা কিছুটা খোঁড়াই রয়ে গেছে।

এই সেই জীবনলাল! আমার কৈশোরের বন্দী রাজকুমার। দিদি আর তসলিমার স্বপ্নের মানুষ।

স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী কালেও রাজনীতিতে জীবনলালের মতন মানুষের কোনো স্থানই নেই। এর আগেও জীবনলাল ও তার বন্ধুরা ছিল একটি ছোট্ট হঠকারী দল।

সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন যারা দেখতো, তারা প্রায় অধিকাংশই তিরিশের দশকে শেষ হয়ে গেছে, বাকিরা আন্দামানে। চল্লিশের দশকে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগই প্রবল।

জীবনলালের সঙ্গে কোনো বড়ো দলের যোগাযোগ ছিল না। তাদের নিজস্ব একটা গোষ্ঠী ঠিক করেছিল, নেতাজী সুভাষ বসু যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আসাম দিয়ে ঢুকবে, তখন দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ইংরেজদের ওপর চোরা গোপ্তা আঘাত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আরও দুর্বল করে দিতে হবে। এটাই রণনীতি, অন্যান্য দেশের বিপ্লবীরাও এরকমই পরিকল্পনা নেয়।

কিন্তু সুভাষবাবু শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজের বেড়া ভাঙতে পারেননি। জীবনলালের দলও সুবিধে করতে পারেনি বিশেষ কিছু, তারা অনেকেই আঘাত হানতে গিয়ে নিজেরা প্রাণ দিয়েছে, কেউ কেউ ধরা পড়ে জেলে অত্যাচারিত হয়েছে। অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও যে জীবনলাল বেঁচে আছে, সেটাই আশ্চর্যের।

সফল হোক বা ব্যর্থ হোক, দেশের জন্য যারা প্রাণ তুচ্ছ করেছিল, দেশের স্বাধীনতায় তাদের প্রত্যেকেরই যতো সামান্যই হোক কিছু না কিছু ভূমিকা তো আছেই। ইংরেজরা যে প্রতিবাদ বা বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, এরাও তার অঙ্গ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর জওহরলাল নেহরুর দল প্রবল ঢক্কানিনাদে জানাতে লাগলো সব কৃতিত্বই তাদের। জীবনলালের মতন যারা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে, তারা কেউ না।

জীবনলাল তবু রাজনীতি ছাড়েনি। একটা আলাদা দল গড়ে মাঝে মাঝে মিছিল করে, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে চ্যাঁচায়।

সে বেহালার দিকে একটা কলেজে পার্ট টাইম লেকচারশিপ জোগাড় করেছে কোনোক্রমে, সেটাই তার জীবিকা। থাকে বউবাজারের এক মেসে।

জীবনলাল যেদিন সকালবেলা আমাদের বাড়িতে এলো, আমি ভেবেছিলাম, আমাদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে যাবে। বিপ্লবী জীবনলাল আসছে। অসীম সাহসী জীবনলাল। পুলিশ ঘিরে

ফেললেও সে ছাদের পাইপ বেয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এরকম অনেকবার সে পালিয়েছে। দু' দুটো স্বদেশী ডাকাতির নেতৃত্ব দিয়েছিল। খবরের কাগজে তার নাম বেরতো প্রায়ই। বাসুমামা তো নাম শুনেই চিনেছিল জীবনলালকে।

সেদিন রবিবার। আমাদের বাড়ির সামনের গলিতে পাড়ার ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল, তার মাঝখান দিয়ে হঠাৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলো জীবনলাল, কেউ ভ্রূক্ষেপও করলো না।

আমি কৃতিত্ব নেবার জন্য আমার দুটি চেনা ছেলেকে ডেকে ফিসফিস করে বললাম, ইনি কে জানিস? ইনি জীবনলাল মিশ্র!

তারা চোখ কুঁচকে বললো, সে আবার কে?

আমি তবু সংক্ষেপে তাদের জীবনলালের জীবনকাহিনী শুনিয়ে দিলাম।

একজন হেসে বললো, দস্যু মোহন?

অন্যজন বললো, চল, চল, ফিল্ডিং দে!

আমাদের বসবার ঘরে সোফা-সেট কিংবা টেবিল-চেয়ার নেই। শুধু একখানা চৌকি পাতা। জীবনলাল এসে প্রায় দেয়াল ঘেঁসে গড়িয়ে পড়লো। একটা সস্তার সিগারেট ধরিয়ে বাবাকে বললো, দাদা, বৌদিকে বলুন, আমাকে মগে করে চা দিতে। কাপে চা খেলে আমার শানায় না।

জীবনলালের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এই ব্যক্তিটি ভারতবর্ষের ইতিহাস বদলাতে কতখানি অংশ নিয়েছে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারটির নিয়তি যে এই একটা মানুষের জন্য বদলে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাসুমামা, বাবা, মা, দিদি, আমি এই মানুষটাকে কেন্দ্র করেই একটা বৃত্তে ঘুরছি। এখনও ঘুরছি। এমনকি তসলিমাও এখনো

এই বৃত্তে ঘুরছে কিনা কে জানে !

জীবনলালের কথাবার্তা অতি সাধারণ। কেমন যেন ক্লান্ত ক্লান্ত ভাব। সে পরাধীন আমলের কথা, জেল খাটার কথা, পুলিশের অত্যাচারের কথা কিছুই বলে না। শুধু বর্তমান রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলে সে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, দিল্লি ও পশ্চিমবাংলার শাসক-নেতাদের মুণ্ডুপাত করে বিশ্রী ভাষায়।

জীবনলাল রোমান্টিকও নয়। জ্বলন্ত আদর্শবাদীও মনে হয় না তাকে। তার আগেকার বিপ্লবীপনা যেন ছিল একটা হুজুগ। সে যখন কলেজের মাইনে বাড়া কিংবা মেসের রান্নার ঠাকুরের মাছ চুরি বিষয়ে কথা বলে, তখন আমার কষ্ট হয়। একজন বিপ্লবীকে কি এই সব কথা মানায় ?

আমার আরও কষ্ট হয় দিদির প্রতি জীবনলালের ব্যবহার দেখে। দিদি যে জীবনলালকে তার হৃদয়ের কোথায় স্থান দিয়েছিল, তা জীবনলাল কিছুই জানে না। জীবনলালের চোখে আমি যেমন 'সন্তোষদার ছেলে', সেই রকমই দিদিও শুধু 'সন্তোষদার মেয়ে'।

দু' তিন দিন আসা-যাওয়া করার পরই জীবনলাল দিদিকে দেখলে বলে, ও ভাই রানী, একটু আদা দেওয়া চা খাওয়াবে। গলায় যে ঠাণ্ডা লেগে আছে, কিছুতেই সারছে না।

জীবনলাল চা খেতে পারে বটে ! আমাদের বাড়িতে এসে এক-দেড় ঘণ্টা থাকলেই সে তিন চার কাপ চা খায়। অন্য কোনো খাবারে তার রুচি নেই। মা কোনোদিন ঘুগনি, হালুয়া কিংবা রুটি তরকারি দিতে চাইলেও সে হাত জোড় করে প্রত্যাখ্যান করে। জেলখানার অত্যাচারে তার হজমশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। গলা গলা ভাত আর মশলা ছাড়া মাছের ঝোল তার একমাত্র খাদ্য।

আমি লক্ষ করেছি, দিদি পারতপক্ষে জীবনলালের সামনে আসতে

চায় না।

তবে, আমাদের বাড়িতে রান্নার অন্য লোক নেই, কাজের লোক নেই, মায়ের শরীর ইদানীং খারাপ যাচ্ছে, তাই দিদিকে অনেক কাজ করতে হয়, চা দিতে আসতে হয়।

সাড়ে চার মাস কেটে গেছে, ইন্দুদা দিদিকে নিতে আসেনি। চিঠিও লেখে না। শুধু মাসে মাসে পনেরো টাকা মানি অর্ডার করে পাঠায়, তার মেয়ের দুধ খাবার খরচ হিসেবে।

ইন্দুদা নিজে আমাকে বলেছিল, সে এসে দিদি আর মানুকে নিয়ে যাবে এখান থেকে। ইন্দুদা না এলে আমাদের পক্ষে দিদিকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার এক এক সময় মনে হয়, যুদ্ধের সময়, সেই বিপদের কালে মা আমাদের নিয়ে তার বাপের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছিল অনেকদিন, আমাদের কলকাতায় এনে রাখার সাধ্য ছিল না বাবার, তখন আমার মামা-মামিরা মাকে কতো করম খোঁটা দিতো। দিদিরও কি একদিন সেই অবস্থা হবে?

এই কথাটা ভাবলেই আমার মনে হয় যেন শরীরে জ্বর আসছে।

মা কিন্তু সত্যিই দিদিকে আর ভালোবাসে না আগের মতন। প্রথম প্রথম কৃষ্ণনগর থেকে নিয়ে আসার পর দিদির প্রতি মায়ের কত যত্ন। দিদির শরীর ভেঙে গেছে বলে তাকে জোর করে দুধ খাওয়ানো। নিজে মাছ না খেয়ে দিদির জন্য বেশি মাছ। নিজের পুরোনো বেনারসী শাড়িগুলোর মধ্যে একখানা শুধু ভাবী পুত্র-বধূর জন্য রেখে বাকি সব দিদিকে দিয়ে দেওয়া। দিদিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়া।

এখন সে সব প্রায় বন্ধ। মা এখন দিদিকে আকারে ইঙ্গিতে প্রায়ই বলার চেষ্টা করে, ইন্দুদাকে বেশি প্রশ্রয় দিলে সে হয়তো আর কোনো দিনই দিদিকে নিতে আসবে না। স্বামী ছাড়া কি নারীর

আর কোনো ভবিষ্যৎ আছে ? স্বামীকে যে বসে রাখতে পারে না, সেই স্ত্রী নিজেই অপদার্থ।

মা বলে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আমি দুটো ছেলে মেয়ে নিয়ে স্বামীর খোঁজে কলকাতায় চলে আসিনি ? দারোয়ানের ঘরে থাকিনি ? তাতেও কত সুখ ছিল।

দিদি ইঙ্গিতগুলো সব বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু বলে না।

জীবনলাল আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। বেহালার কলেজ থেকে ফেরার পথে সে আমাদের বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায়। মায়ের কাছেই আসে। বাসুমামার সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব, কিন্তু বাসুমামা দুপুরে-বিকেলে বাড়িতে থাকে না। পেট্রল পাম্পে ডিউটি দিতে হয়। জীবনলাল এমনিই বসবার ঘরের চৌকিতে শুয়ে থাকে, চায়ের ফরমাস করে, মা এলে মায়ের সঙ্গে গল্প করে। জীবনলালের বাবা-মা কিংবা দিদি নেই। তার দাদা-বৌদি থাকেন বেনারসে। ইন্দুদার মতন, জীবনলাল কখনো কোনো জিনিসপত্র আনে না। সবাই জানে, জীবনলালের পয়সাকড়ি নেই।

আমিও এখন প্রায় সময়ই বাড়িতে থাকি না। আমার এখন কলেজের বন্ধু-বান্ধব হয়েছে! আমাদের আড্ডা বসে হাজরা পার্কে। বিজলি গ্রিলে ধারে কাটলেট খাই। একটা টিউশানি নিয়েছি, তাই আমার নিজস্ব হাত খরচের কিছু টাকা হয়েছে। তার থেকে অর্ধেক টাকা দিই দিদিকে।

তবু কখনো আমি হঠাৎ দুপুরে-বিকেলে বাড়িতে ফিরে দেখেছি, জীবনলাল একাই শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছে, কিংবা মায়ের সঙ্গে গল্প করছে। দিদি সেখানে থাকে না। দিদির সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করার কোনো আগ্রহই নেই জীবনলালের।

আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফতেপুরে আপনি যখন পুলিশের হাতে ফাইনালি ধরা পড়লেন, আপনাকে হাতকড়ি বেঁধে

নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল নৌকোয়, আমরা তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা ষ্টিমারের ডেকে। আমরা আপনাকে দেখেছিলাম। আপনি আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন ?

জীবনলাল বলেছিল, হ্যাঁ, বৌদিকে দেখেছিলাম। তুমিও পাশে ছিলে বুঝি ? তুমি তো তখন বেশ ছোট, তাই লক্ষ করিনি।

আমি বলেছিলাম, আমার দিদিও ছিল। মায়ের অন্য পাশে।

জীবনলাল নিস্পৃহ ভাবে বলেছিল, ও তাই বুঝি ! খেয়াল করিনি ! তোমার মা ছিলেন যেমন সুন্দরী মহিলা, তেমনি তেজী, তাঁর ছবিটাই মনে গেঁথে আছে !

দিদি জীবনলালের সামনে বিশেষ আসে না । কিন্তু দিদি যে প্রায়ই একা একা নিজের ঘরে বসে কাঁদে, তা আমি জানি।

মা একদিন বাবাকে বললো, এই জীবনলাল ছেলেটা সম্পর্কে আমার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। বাসু আর জীবনলাল আমার কাছে সমান। বাসু তো বিয়ে করবেই না বলে দিয়েছে। জীবনলালও কি সারাটা জীবন মেসে-হষ্টেলে কাটিয়ে দেবে ? ওর একটা বিয়ে দিলে হয় না !

বাবা বললো হ্যাঁ, দ্যাখো না, যদি ওকে রাজি করাতে পারো। ও রাজি হলেই ব্যবস্থা করা যায় । বাংলাদেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই !

মা বললো, ওর বাবা-মা কেউ নেই । ওর বিয়ের ব্যবস্থা কে করবে ? সেদিন কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে একটি মেয়েকে দেখেছি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আলাপ হলো, কাছেই থাকে।

বাবা বললো, লাগিয়ে দাও না। কিছু টাকা পয়সার দরকার হলে আমি জোগাড় করবো । ব্রজবাবুর কাছে ধার চাইলেই পাওয়া যাবে ।

জীবনলাল এখন আর পলাতক বিপ্লবী নয়। তবু ওর সব দায়িত্ব

যেন আমার মায়ের আর বাবার। জীবনলালের জন্য বাবা টাকা ধার করতেও রাজি আছে।

সেদিন আমি মনে মনে বলেছিলাম, হে স্বাধীনতা, তুমি সত্যিই ভারতবর্ষে এলে! তবে কেন আরও আড়াই-তিন বছর আগে এলে না? তা হলে জীবনলালের সঙ্গে আমার দিদির বিয়ে হতে পারতো। তারপর জীবনলাল পুলিশের গুলি কিংবা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলেও দিদির একটা গরিমা থাকতো। একটা বিশেষ গর্ব নিয়ে দিদি বাঁচতে পারতো বাকী জীবন।

তার বদলে ইন্দুদা এ কী করলো?

উপকার করার ছলে ইন্দুদা এক একটা পরিবারে ঢোকে, সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করে, তারপর সেই মেয়েটিকে-চন্দননগরে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে নিয়ে যায়। কেমন সে বন্ধুটি, ঠিক কল্পনা করতে পারি না।

মা পাত্রী ঠিক করে ফেললো, জীবনলালও আপত্তি জানালো না। মায়ের প্রতি তার অগাধ আস্থা। আমার মা জীবনলালের চোখে তার মা, বৌদি, দিদি, বন্ধু, একাধারে সব কিছু। মাও জীবনলালকে দু'তিন দিন না দেখলে উতলা হয়ে পড়ে।

আমি ফ্রয়েড পড়তে শুরু করেছি। মায়ের সঙ্গে জীবনলালের এই যে সম্পর্ক, এটাও এক ধরনের প্রেম কি না, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। জীবনলাল যখন উচ্ছ্বসিতভাবে আমার মায়ের প্রশংসা করে, তখন মায়ের মুখ লাল হয়ে যায়, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ে। এটা এক ধরনের প্রেম নিশ্চিত। কিন্তু সাধারণভাবে এর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

আরও একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি। জীবনলালের ভালো করতে গিয়ে, জীবনলালের জীবনটা ফেরাতে গিয়ে, মা যে নিজের মেয়ের দারুণ ক্ষতি করছে, তা মায়ের বোধের অতীত।

আমার চোখে জীবনলাল এখন এক অতি সাধারণ মানুষ। কিন্তু দিদির চোখে এখনো মোহের অঞ্জন লেগে আছে। দিদি জীবন-লালের কাছাকাছি বিশেষ আসে না। দূর থেকে দেখে। তাতেও এক ধরনের সুখ পায়। এরপর জীবনলালের বিয়ে হয়ে গেলে দিদির জীবনে আবার একটা ধাক্কা লাগবে। জীবনলালও কি আর বিয়ের পর এ বাড়িতে বিশেষ আসবে?

হলোও ঠিক তাই। জীবনলালের সঙ্গে বনানী নাম্নী একটি যুবতীর রেজিস্ট্রি বিয়ে হলো আমাদের বাড়িতেই। দিদি সেদিন সর্বক্ষণ রান্নাঘরে বসে রইলো, একবারও বিয়ের জায়গায় এলো না। কেউ ডাকলোও না তাকে।

জীবনলাল বাড়ি ভাড়া নিল হরি ঘোষ স্ট্রিটে, সে অনেক দূর। প্রথম প্রথম বউকে নিয়ে কয়েকবার এলো আমাদের বাড়িতে, তারপর সে নতুন সংসারে ডুবে গেল।

কেটে গেল আরও একটা বছর।

এর মধ্যে আমি দু' বার গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগরে।

আমার সঙ্গে ইন্দুদার ব্যবহারে কোনো বৈষম্য নেই। দু'বারই খাতিরযত্ন করলো প্রচুর, জোর করে বাড়িতে ধরে রাখলো দু' একটা দিন, ফেরার সময় গাদা গাদা মিষ্টি দিয়ে দিলো সঙ্গে, কিন্তু দিদিকে ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে একটা কথাও বললো না।

দিদি আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছিল, আমি যেন নিজে থেকে ও সম্পর্কে কিছুই না বলি।

লক্ষ করলাম, ইন্দুদা দিন দিন আরও বেশি ধনী হচ্ছে। সম্পত্তি অনেক বেড়েছে। ওকালতিতে তার খুব পশার। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে-সব উদ্বাস্তু কিছু টাকাকড়ি আনতে পেরেছে, তারা অনেকেই জমি কিনেছে কৃষ্ণনগর-বহরমপুর অঞ্চলে। কেউ কেউ মুসলমানদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাড়ি ঘর বিনিময় করেছে। এই সব

ক্ষেত্রে শারিকি মালিকানার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে।

ইন্দুদা উদ্বাস্তুদের পক্ষে প্রধান প্রবক্তা। তাদের সব মামলা ইন্দুদা গ্রহণ করে। তা বলে সে ফি নিতে ছাড়ে না। কারণ এটা পেশার ব্যাপার। দিন দিন আঙুল ফুলে কলাগাছ। কৃষ্ণনগরে ইন্দুদার মতন সার্থক উকিল আর কেউ নেই। দেশ বিভাগের ফলে ইন্দুদার মতন লাভবান হতে আর কারুকে দেখিনি।

ইন্দুদা যেমন রোজগার করে, তেমনই দু' হাতে টাকা ছড়ায়। গরিব ছাত্রদের পড়াশুনোয় সাহায্য করে। তাছাড়া সে একটা কোনো পরিবার বেছে নেয়। সেই পরিবারে একটি অন্তত সুন্দরী, সপ্রতিভ যুবতী মেয়ে থাকা চাই। ইন্দুদা সেই পরিবারটিকে যথেষ্ট সাহায্য করবে ঠিকই, তার বদলে তাদের একটি যুবতী মেয়েকে সে চন্দননগরে বেড়াতে নিয়ে যাবে! আমার দিদির মতন, অন্য মেয়েরা বোধহয় তত আপত্তি করে না।

আমার কলেজের বন্ধু নিলয়ের বাড়ি কৃষ্ণনগরে, একবার তার বাড়িতে উঠলাম। তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ইন্দুদা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল। ইন্দুদার এমনিতে বেশ সুখ্যাতি আছে। কয়েকটা লাইব্রেরি তার কাছ থেকে মোটা চাঁদা পায়। ইন্দুদার কাছে পরীক্ষার ফি-এর টাকা চাইতে এসে কেউ কখনো ফেরে না। তার দান-ধ্যান ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে অনেকেই অভিভূত। ইন্দুদা তার নারী-ঘটিত দুর্বলতার কথা অতি সাবধানে গোপন রাখে।

ইন্দুদাকে খারাপ লোক তো বলাও যায় না। অনেক লোক সত্যিই তো তার কাছে উপকার পায়। শুধু কোনো মেয়েকে জয় করা হয়ে গেলে তার সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে পড়ে। এমনকি নিজের স্ত্রী সম্পর্কেও।

আজ বুঝতে পারি, বর্ধমান রেল স্টেশনে থেকে ফেরার পথে দিদি

কেন বলেছিল, লোকটা খুব স্বার্থপর। দিদি তখনই বুঝেছিল। সত্যিই তো ইন্দুদা আসলে বিষম স্বার্থপর, তার পরোপকারও একটা বিশেষ স্বার্থের জন্য। অথচ বাইরের কোনো লোক একথাটা শুনলে বিশ্বাস করবে না।

ইন্দুদার দিদি আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করেছেন, রানী কেন ফিরছে না? এতদিন বাপের বাড়িতে রয়ে গেছে কেন?

আমাকে প্রত্যেকবার বলতে হয়, মায়ের খুব শরীর খারাপ, আর কেউ দেখাশুনো করার নেই। আর কিছুদিন বাদেই আসবে।

তিনি মুখখানা গোমড়া করে ফেললেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, দিদি তার স্বামীর সেবাযত্নের কথা ভাবে না, বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতে চায়। দিদিও স্বার্থপর।

ইন্দুদা যে দিদিকে আনবার কোনো ব্যবস্থাই করে না, সে কথা আমার মুখ ফুটে বেরোয় না কিছুতেই।

নিলয়ের বাড়িতে যেবার উঠলাম, সেবারেও ইন্দুদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। ধরা পড়া চোরের মতন আমি বলতে লাগলাম, নিলয় আমাকে জোর করে ধরে এনেছে, এখান থেকে আমরা উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যাবো, ফেরার পথে এখানে নেমে তোমার বাড়িতে···

ইন্দুদা হেসে বললো, একবার অন্তত আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসিস।

পকেটে হাত দিয়ে আবার বললো, মনি, তুই তো সিগারেট ধরেছিস, খাবি নাকি একটা?

আমি একটু কেঁপে উঠলাম। লুকিয়ে চুরিয়ে দু' একটা সিগারেট এখন টানি বটে, কিন্তু সে খবর ইন্দুদা কী করে জানলো? মা পর্যন্ত জানে না।

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে ইন্দুদা আবার বললো, তোদের

বাড়িতে জীবনলাল নামে একজন জেলখাটা লোক প্রায়ই আসে। তাই না? তোর বাবা-মায়ের কাছে ওর কথা অনেক শুনেছি। তোর দিদিও লোকটাকে খুব শ্রদ্ধা করে।

ইন্দুদা সব খবর রাখে!

আমি বোকার মতন তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, জীবনদার বিয়ে হয়ে গেছে! আমাদের বাড়িতেই বিয়ে হলো!

ইন্দুদা হো হো করে হেসে উঠে বললো, তাই নাকি? এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছে?

ইন্দুদার কথার মধ্যে আর কোনো ইঙ্গিত ছিল কি না ধরা গেল না। ইন্দুদার ক্ষুরধার বুদ্ধি। তাছাড়া ইন্দুদা উকিল, তার সঙ্গে আমি কথায় পারবো কেন?

কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসেই একটা দুঃসংবাদ পেলাম।

জীবনলালের ভাগ্যে সুখ নেই। বিয়ে করে নতুন সংসার পেতে বসেছিল, তার মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গিয়ে ফুটে উঠেছিল জীবনের রং, আবার সব নষ্ট হয়ে গেল। বনানী বৌদি বেশ হাসিখুশি, চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে, স্বাস্থ্যও ভালো, তার সম্পর্কে কারুর কোনো আশঙ্কা ছিল না। তবু সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে হাসপাতালে মারা গেল বনানী বৌদি। শিশুটিও বাঁচেনি।

এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবার পরেও জীবনলাল এলো না আমাদের বাড়ি। সে নাকি কলেজেও পড়াতে যায় না, পার্টি অফিসে যায় না। বাড়ি থেকেই বেরোয় না। নিজের ঘরখানাকে সে জেলখানা বানিয়ে ফেলেছে।

বাবা আর মা দু' দিন দেখা করতে গেল, জীবনলাল তাদের সঙ্গেও দুটো-একটার বেশি কথা বলেনি।

ফিরে এসে মা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো। তার ধারণা, এবার

জীবনলাল মরেই যাবে। কিছু তো খায়ও না মানুষটা।

বাসুমামার সঙ্গেই জীবনলালের বেশি বন্ধুত্ব ছিল। ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতে খুব অসুবিধে হয় বাসুমামার, তবু সে রোজ যায় হরি ঘোষ স্ট্রীটে। একদিন সে জীবনলালকে জোর করে ধরে নিয়ে এলো।

মাকে বাসুমামা বললো, দিদি, ওকে কিছুদিন আমাদের কাছে রাখি। না হলে ও তো আত্মহত্যা করতে চলেছে দেখছি!

বাসুমামা নিজের দাদার কাছে ফিরে যায়নি। আমাদের সঙ্গেই থাকে। এতদিন বাসুমামা আমার ঘরেই শুতো। এখন বাসুমামা আর জীবনলালের জন্য দিদির ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হলো।

সত্যিই তো, জীবনলাল আমাদের পরিবারের একটি অঙ্গ, সে কেন দূরে থাকবে? আগে থেকেই কেন আমরা এই কথাটা ভাবিনি?

এতদিনে দিদির সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। সে আর আড়ালে আড়ালে থাকে না। মন-প্রাণ-সর্বস্ব ঢেলে দিয়ে সে জীবনলালের সেবা করে। বাটিতে দুধ-ভাত মেখে চামচ দিয়ে জীবনলালকে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করে। যেন সে একটা অবোধ শিশু।

মা যেন দিদির এই বাড়াবাড়ি ঠিক পছন্দ করতে পারলো না।

বাসুমামাকে পেট্রল পাম্পে চলে যেতে হয়, জীবনলালের ঘরে দিদি যেই একটু একা থাকে, অমনি মা তাকে ডাকাডাকি করে। কিংবা জীবনলালকে স্নান করবার জন্য বাথরুমে পাঠায়। কিংবা মা নিজেই এসে এ ঘরে বসে।

জীবনলালকে সেবা করার ব্যাপারে মা আর দিদির মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলছে, তা আমার নজর এড়ায় না। এই প্রতিযোগিতায় মা ক্রমশ হেরে যাচ্ছে, তা কি মা বুঝতে পারছে?

মাঝে মাঝে দিদি মানুকে জীবনলালের কোলে বসিয়ে দেয়। মানু

এখন দিব্যি টরটরে কথা বলতে শিখেছে। জীবনলাল সর্বক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে, প্রায় কোনো কথা বলে না। তাই মানু তাকেও মনে করে একটা খেলনা। সে জীবনলালের গা বেয়ে ওঠে, চুল ধরে টানে, রং পেন্সিল দিয়ে তার গোঁফ আঁকে।

জীবনলালের সামনে বসে দিদি পুরোনো গল্প শুরু করে এক এক সময়।

বাবা আর বাসুমামার সঙ্গে জীবনলাল যেদিন প্রথম এসেছিল গ্রামের বাড়িতে···সন্ধেবেলায় জীবনলাল পায়ের আঘাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল, তখন দিদি তাকে জল দিতে গিয়েছিল।

দিদি জিজ্ঞেস করে, আপনার মনে আছে, তসলিমা নামে একটি মেয়ের কথা? আমিনুল চৌধুরী সাহেবের গোলাঘরে আপনি ছিলেন, তখন তাকে দেখেননি!

জীবনলাল কোনো উত্তর দেয় না, শুধু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জীবনলালের রাজনৈতিক দলের বন্ধুরা একদিন তাকে নিয়ে গেল। তাদের কী একটা জরুরি মিটিং ছিল। অনেক রাতে তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে এসে তার এক ডাক্তার বন্ধু বললো, ওকে নিয়ে যাওয়াটা ভুল হয়েছিল। এখন ওর মনের ওপর বেশি চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। আরও কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। আমরাই আসবো মাঝে মাঝে। দু' একটা ওষুধও খাওয়াতে হবে।

মাসখানেকের মধ্যে একটু একটু কথা ফুটলো জীবনলালের মুখে। এখন সে মানুকে নিয়ে খেলা করে। মানু কিছুক্ষণ তার কাছে না থাকলেই সে দিদিকে জিজ্ঞেস করে, মানু কোথায়? মানু কোথায়?

জীবনলাল যেন মানুর বয়েসী হয়ে গিয়ে খুব মন দিয়ে সাপ লুডো খেলে তার সঙ্গে, দিদি এক কোণে বসে কিছু একটা শেলাই করে, আর মাঝে মাঝে গাঢ় চোখে ঐ দু' জনের দিকে তাকায়।

সেই দৃশ্যটা দেখে আমার আবার মনে হয়, হায় স্বাধীনতা, তুমি আর একটু আগে আসতে পারলে না। আর আড়াই বছর আগে জীবনলাল জেল থেকে ছাড়া পেলে দিদির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারতো! হু' জনের জীবন এভাবে নষ্ট হতো না!

এক রবিবার সন্ধেবেলা, আমরা সবাই তখন বাড়িতে উপস্থিত, এই সময় এলো ইন্দুদা।

এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি, ব্যাগের মধ্যে মা ও দিদির জন্য শাড়ি, মেয়ের জন্য জামা, বাবার জন্য শান্তিপুরী ধুতি, এমনকি আমার জন্যও একখানা ধুতি।

সহাস্য মুখ, এতদিনের ব্যবধানের কোনো চিহ্নই নেই। মাকে বাবাকে প্রণাম করলো, হৈ চৈ করে জমিয়ে তুললো আগেকার মতন। জীবনলালের সঙ্গেও যেচে আলাপ করলো।

বললো, আপনিই তো জীবনলাল মিশ্র। আপনার কত নাম শুনেছি। আপনারা নমস্য ব্যক্তি, দেশের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরা তো কিছুই করিনি।

বাসুমামাকে বললো, এতদিন জেল খাটলেন, এত অত্যাচার সহ্য করলেন, কিন্তু এই কী স্বাধীনতা আনলেন বলুন তো? প্রতিদিন হাজার হাজর উদ্বাস্তু আসছে। বেচারাদের মাথা গোঁজার সামান্য আস্তানাও নেই। দিল্লির কর্তারা তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না।

ইন্দুদার ব্যবহার সহজ, সাবলীল, কিন্তু আমরা আড়ষ্টতা কাটাতে পারছি না।

মা শুধু একবার খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললো, তুমি এতদিন পরে এলে। আমরা কবে থেকে আশা করে আছি, তুমি আসবে, আসবে!

এইবার ইন্দুদা তার আগমনের আসল উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলো। এক মক্কেলের কাজে তাকে গতকাল কলকাতায় আসতে হয়েছে।

ফিরে যেতে হবে আজই রাত্তিরের ট্রেনে। সে মান্নুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তার মা নাতনীকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, সুতরাং এখন মান্নুকে তাঁর কাছে রাখা উচিত।

মা ফস করে বলে ফেললো, মান্নুকে নিয়ে যাবে, আর রানী যাবে না?

ইন্দুদা মিষ্টি হেসে বললো, আপনার শরীর খারাপ শুনেছি, ও যদি আরও কিছুদিন থাকতে চায়, থাকুক না এখানে।

কী অসম্ভব চতুর আর নিষ্ঠুর এই ইন্দুদা। মেয়েকে নিয়ে যাবে, কিন্তু স্ত্রীকে নেবার কথা নিজের মুখে কিছুতেই বলবে না।

চন্দননগরে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব শুনে দিদি ঘোরতর আপত্তি করেছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে চন্দন-নগরে নিয়ে গিয়েছিল, বিয়ের আগেই। জেদ বজায় রেখেছিল ইন্দুদা। এখন যেন সে চাইছে, দিদি ভিখিরির মতো বলুক, ওগো, আমাকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে চলো।

আমার সন্দেহ হলো, ইন্দুদা বোধহয় মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে দূর থেকে আমাদের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। সে সব খবর জানে। মান্নুকে অবলম্বন করে যে জীবনলাল আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছে, মান্নুকে কেন্দ্র করে যে দিদি আর জীবনলালের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, সেটা ইন্দুদা ভেঙে তছনছ করে দিতে চায়। নইলে ঠিক এই সময়েই সে হঠাৎ আসবে কেন?

জীবনলাল আর দিদিকে কোনো অতীন্দ্রিয় সুখও ভোগ করতে দেবে না সে!

রাত পৌনে এগারোটায় ট্রেন। ইন্দুদা জানালো, তাকে একটা কাজে বালিগঞ্জ যেতে হবে। ঠিক নটার সময় ট্যাক্সি নিয়ে এসে সে মান্নুকে তুলে নেবে।

মা জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখানে খাবে না ?

ইন্দুদা অন্য জায়গায় খেয়ে আসবে বলায় মা খুবই পেড়াপিড়ি করতে লাগলো। তখন ইন্দুদা এখানে খেয়ে যেতে রাজি হয়ে যেন ধন্য করলো আমাদের।

ইন্দুদা বেরিয়ে যেতেই মা দিদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

মানু আমাদের সকলের প্রিয়। তার জন্য সারা বাড়ি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে থাকে। তাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকবো ?

কিন্তু মানুর বাবা যদি তাকে নিতে আসে, তাতে আপত্তি করার সাধ্য কি কারুর আছে ?

আবার মানুকে চলে যেতে দিয়ে দিদি একলা থাকবে, তাও কি সম্ভব ?

বন্ধ ঘরে দিদির সঙ্গে মায়ের কী কাণ্ড চলছে কে জানে ? উচ্চ কণ্ঠের দু' একটা টুকরো শব্দ শুধু ভেসে আসছে বাইরে।

বসবার ঘরে আমরা সবাই থুম মেরে বসে আছি। বাবা, আমি, বাসুমামা, জীবনলাল। ইন্দুদা যেন একটা বোমা ফাটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। জীবনলালের কোলে মানু। সে এখনো কিছুই বোঝেনি। নিজের বাবাকে সে ভালো করে চেনেই না। যাবার সময় নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করবে।

এক সময় বাসুমামা বললো, না, জামাইবাবু, এ হয় না ! মানু চলে যাবে, আর রানী এখানে থাকবে, এ কি একটা কথা হলো ? আপনি ইন্দুকে বারণ করে দিন।

বাবা বললো, আমি বারণ করলেই বা সে শুনবে কেন ?

—আপনি বলে দিন যে আপনার এতে মত নেই।

—আমার মতামতের সে মূল্য দেবে ? মেয়ের ওপর বাবার অধিকার নেই ? ঠাকুমা নাতনীকে দেখতে চাইছে, আমরা আটকাতে পারি ?

—এতদিন আসেনি, এখন হঠাৎ দরদ উথলে উঠলো। বাবার অধিকার কতোখানি, সে তো মামলা করলে বোঝা যাবে। ইন্দু আগে মামলা করুক!

বাবা দপ করে জ্বলে উঠে বললো, তুমি আমাকে এই বুদ্ধি দিচ্ছো? মামলা করতে যাবো? ইন্দু নিজেই ঝানু উকিল তা জানো না? একবার মামলায় জড়াতে পারলে সে আমাদের একেবারে জেরবার করে দেবে!

একটু থেমে বাবা আবার বললো, হুঃ! ওসব কথা উচ্চারণ করাও পাপ। একবার ইন্দুর কানে গেলে সে আর রানীকে কোনো দিন ঘরে নেবে? তখন কী অবস্থা হবে মেয়েটার? সে কি সারা জীবন তার বাবা মায়ের ভরসায় থাকবে?

জীবনলাল মানুর মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

অধিকাংশ সময় নিঃশব্দ থাকলেও সে তো আর পাগল নয়। সে সব বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই। মানুর সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। তার মুখে কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। সত্যি-কারের গভীর আঘাতের বোধহয় কোনো অভিব্যক্তি হয় না।

মায়ের ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, দিদি ছুটে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। মাও সঙ্গে সঙ্গে এসে দিদির হাত চেপে ধরে আবার টেনে নিয়ে গেল।

আমরা কেউ উঠলাম না, এর পর কেউ আর একটাও কথা বল-লাম না।

খানিক বাদে মা বেরিয়ে বললো, মনি, হাঁ করে বসে আছিস? তোর বাবা তোকে বাজারে পাঠাতে পারেনি? ইন্দুকে খেয়ে যেতে বলেছি না? সবই কি আমাকে দেখতে হবে?

পাঞ্জাবী দোকান থেকে আমি এক ভাঁড় কষা মাংস কিনে আনলাম। ও বেলার কিছু মাছ আছে। তা ছাড়া ইন্দুদা বেগুন ভাজা ভালো-

বাসে।

ঠিক পৌনে ন'টার সময় ফিরে এলো ইন্দুদা। হাতে আইসক্রিম। মান্নুর হাতে দিয়ে বললো, মামনি, এবার তৈরি হয়ে নাও। আমরা ট্রেনে করে যাবো। কু ঝিক ঝিক ঝিক…

আমরা রান্নাঘরে বসে খাই। ইন্দুদার জন্য জায়গা করে দেওয়া হলো মায়ের শোওয়ার ঘরে। পাতা হলো হাতে তৈরি আসন, এটা সাধারণত ট্রাঙ্কে তোলা থাকে। এত বড়ো কাঁসার থালাটাও বিশিষ্ট অতিথি না এলে ব্যবহার করা হয় না।

থালার পাশে পাশে বাটি সাজিয়ে দিলো মা।

তারপর বললো, এতদিন পরে এলে, আজই চলে যাবে। বিশেষ কিছু কথাই হলো না।

ইন্দুদা বললো, আসবো, আবার পরে আসবো।

মা জিজ্ঞেস করলো, তোমার মায়ের শরীর ভালো নয় বললে, কী হয়েছে?

ইন্দুদা বললো, সে রকম কিছু নয়। বয়েস তো হলো অনেক। চোখে দেখেন না ভালো, কানে শোনেন না। শরীরও প্রায়ই খারাপ থাকে। কবে চলে যাবেন তার ঠিক নেই।

মা বললো, ভগবানের ইচ্ছেয় আমার শরীর এখন ভালোই আছে। যথেষ্ট খাটতে পারি। রানীর এখন…

ইন্দুদা বললো, এখন ভালো আছেন তা হলে? বাঃ!

মা বললে, রানী তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবে।

ইন্দুদা একমনে খেতে লাগলো।

মা সরে এলো ঘর থেকে। দিদি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি বাথরুমের পাশটায় কোনাকুনি দাঁড়ালাম, এখান থেকে ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। ইন্দুদা একমনে মাংসের হাড় চিবোচ্ছে।

দিদি একটু সময় নিচ্ছে, মৃদু গলায় বললো, মান্নুকে নিয়ে যাবে, ও কি একলা থাকতে পারবে ?

ইন্দুদা বললো, কেন পারবে না ?

দিদি বললো, আমাকে ছেড়ে কখনো থাকেনি।

ইন্দুদা বললো, প্রথম দু' একদিন কাঁদবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। এমন হয়।

দিদি বললো, না, আমি জানি, পারবে না। এই বয়সেই খুব জেদ। একবার কাঁদতে শুরু করলে অন্য কেউ থামাতে পারে না।

ইন্দুদা বললো, সে আমি বুঝবো। আমি যে ওকে নিয়ে যাবো ঠিক করেছি !

দিদি খুব আস্তে আস্তে বললো, তা হলে···তা হলে···আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়।

ইন্দুদা বললো, যেতে হয় যাবে ! তোমার ইচ্ছে করলে যাবে। আমি কি তোমাকে কখনো যেতে বারণ করেছি ?

সম্পূর্ণ পরাজয় মেনে নেবার পর দিদি ছুটে চলে গেল বাথরুমে। জলের কল খুলে দিলো। তাতেও তার কান্নার আওয়াজ চাপা পড়লো না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল সবাই। ট্যাক্সি ডেকে আনলাম আমি। দিদির জন্য এর মধ্যে একটা সুটকেস গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাবাকে, মাকে, এমনকি বাসুমামাকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো ইন্দুদা। জীবনলালকে হাত জোড় করে নমস্কার করে এগিয়ে গেল।

মা দিদিকে ধরে ধরে নিয়ে এলো। দিদি সকলের দিকে একবার তাকালো। কোনো কথা বলতে পারছে না। মুখ নিচু করে আছে। একেবারে দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফেরালো একবার। জীবনলাল

একই জায়গায় একভাবে বসে আছে।

ছু' জনের দৃষ্টি এক জায়গায় থেমে রইলো কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

সেই ছুই ছুঃখী মানুষের চোখে যেন দেশবিভাগের প্রতিচ্ছবি।

ব্যর্থ স্বাধীনতা!